roopbaan

রূপবান

জানুয়ারি-মার্চ ২০১৪ | বর্ষ ১ | সংখ্যা ১

ভালবাসতে
দাও
মোরে

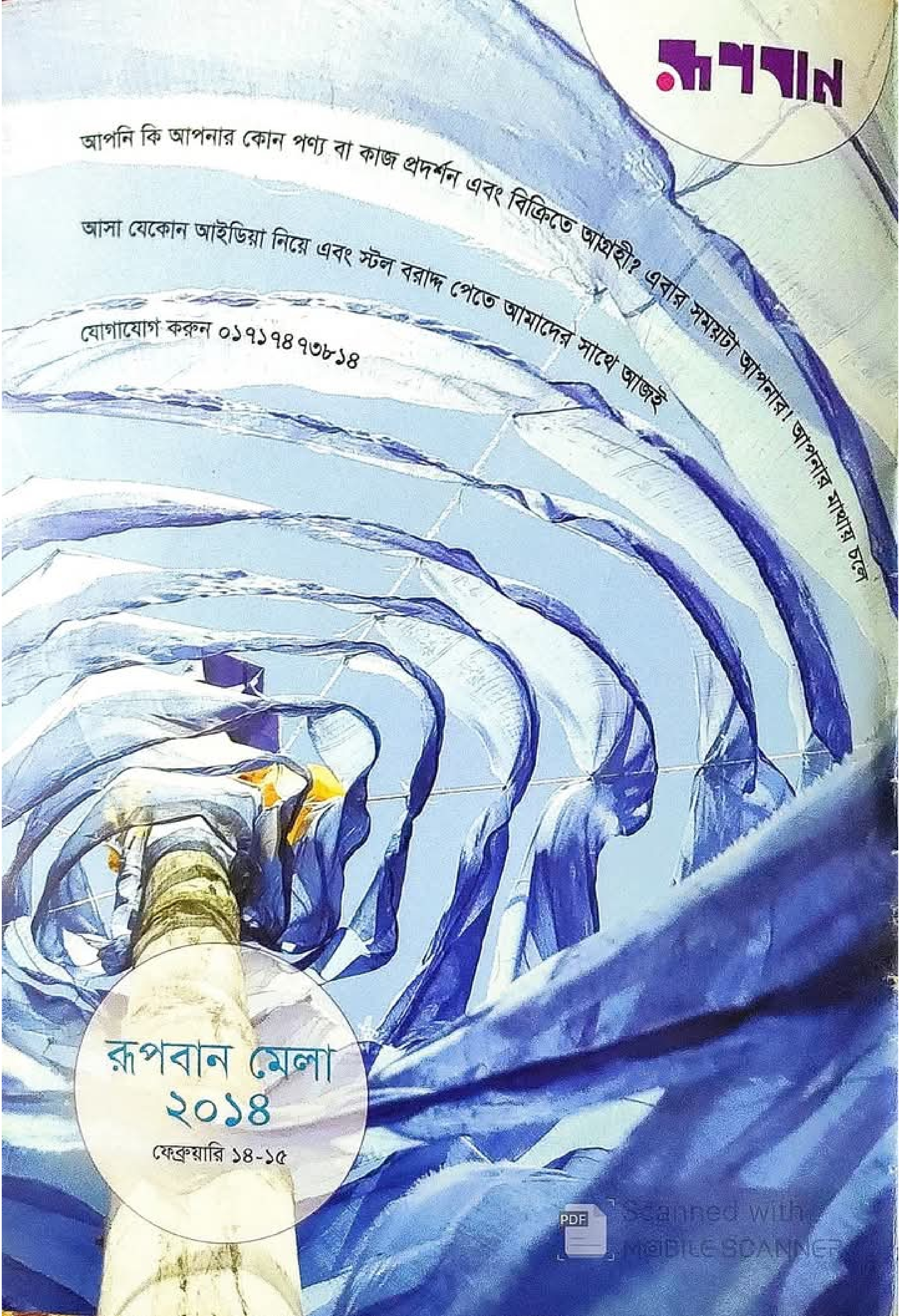
রূপবান
আপনি কি আপনার কোন পণ্য বা কাজ প্রদর্শন এবং বিক্রিতে আগ্রহী? এবার সময়টা আপনার। আপনার মাথায় চলে
আসা যেকোন আইডিয়া নিয়ে এবং স্টল বরাদ্দ পেতে আমাদের সাথে আজই
যোগাযোগ করুন ০১৭১৭৪৭৩৮১৪
রূপবান মেলা
২০১৪
ফেব্রুয়ারি ১৪-১৫

ভালোবাসা

অরণ্য, রাতুল এবং নাম না জানা অন্য সকলের প্রতি,
যারা আজ আমাদের মাঝে নেই,
যাদেরকে আমরা হারাতে না চেয়েও দিনশেষে হারিয়ে ফেলি।
তোমরা না থেকেও আমাদের মাঝে আছো,
তোমাদের জন্য রইলো ভালোবাসা অনিঃশেষ।

সূচি

রূপবান | roopbaan | বর্ষ ১ | সংখ্যা ১ | জানুয়ারি-মার্চ ২০১৪

04 প্রচ্ছদ ভালোবাসতে দাও মোরে
প্রেম সার্বজনীন, ভালোবাসার অধিকারও মানবাধিকার।

10 আমার কিছু কথা ছিল জুনের সকালটা
জুনের সকালে ভালোবাসার মানুষের সাথে প্রথম দেখা হবার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

12 আদর্শলিপি অন্যরকম কিন্তু অস্বাভাবিক নয়
আমাদের চাহিদা আর আকাঙ্ক্ষা হয়তো আর দশজনের চেয়ে অন্যরকম, তাই বলে কি সেটা অস্বাভাবিক?

13 রূপবান সংবাদ
বিগত কয়েক মাসে চারপাশে ঘটে যাওয়া নানা অনুষ্ঠানের খবরাখবর।

14 অগ্রযাত্রা ইউপিআর-এ বাংলাদেশ: প্রসঙ্গ সমকামিতা
গত বছর জাতিসংঘের ইউপিআর-এ আমাদের অংশগ্রহণ।

18 বিজ্ঞানের সচলায়তন মানসিক ব্যাধি?
সমকামিতা কি কোনো মানসিক রোগ? অভিজিৎ রায় করেছেন চুলচেরা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ।

21 আমাদের গল্প ছোঁয়া
সাধারণের স্বপ্নপুরুষ কেমন হয়? সুদর্শন নিশ্চয়! সুদর্শনের সংজ্ঞা কি? নায়ক ন্যায় মুখ? বাহুতে দৃঢ় পেশি?

22 উপপাঠ ঢাকার পাঁচ
একজন পুরুষ হয়ে সঙ্গী হিসেবে আরেকজন পুরুষকে খুঁজে নেবার জায়গা করে দিতে ঢাকা কোনদিন কার্পণ্য করেনি!

28 আলাপচারিতা সারা এবং ৩৭৭ ধারা!
সুপ্রিমকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী সারা হোসেন কথা বলেছেন ৩৭৭ ধারা এবং বাংলাদেশে এর প্রয়োগের আদ্যোপান্ত নিয়ে।

33 কবিতার খাতা কাঠের স্কেল
দিঘীরপাড়ে আলো ছড়ায় জোনাকির দল ...

34 স্ট্রিট ফ্যাশন কালার বটম
আজকাল রাস্তাঘাটে একটু তাকালেই ছেলেদের রঙিন প্যান্ট পরবার ধুম চোখে পড়ে।

36 ভ্রমণ গাঁথা গন্তব্য সিলোম সয় ৪
সিলোম সয় ফোরের অলিতে গলিতে রূপবানদের মুক্তির নানারকম স্বাদের অভিজ্ঞতা!

40 উপপাঠ হলিউডে সমপ্রেম
হলিউডে সমপ্রেমকে কেন্দ্র করে বিবর্তিত চলচ্চিত্রের ইতিহাস।

43 ফিল্ম রিভিউ আভারটো
পেরুভিয়ান ফিল্ম আভারটো আবর্তিত হয়েছে দুই পুরুষের সম্পর্ক এবং তাদের আশেপাশের নানারকম সম্পর্কের উত্থান-পতনের গল্পের ভেতর দিয়ে।

48 খ্যাতিমান যাঁরা মধু-গৌরাখ্যান
ঊনবিংশ শতকের বিখ্যাত বাংলা কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সঙ্গে গৌরদাস বসাকের অন্যরকম প্রেমের উপাখ্যান।

54 অন্দরমহল ২০১৩
গত বছরে ঘরে বাইরে হয়ে যাওয়া নানা অনুষ্ঠানের চিত্রসম্ভার!

56 রাশি রূপ এরিস
ক্রোধ মেষের [illegible]তম শত্রু। এরা সহজেই রেগে যায় এবং রেগে গিয়ে [illegible] যায়।

PDF Scanned with MOBILE SCANNER

সম্পাদকীয়

একটা ম্যাগাজিন ছাপাবো এমন ইচ্ছা বহুদিনের। এই অনলাইন পত্রিকার রমরমা যুগে যখন অনেক নামি পত্রিকা গুটিয়ে নিচ্ছে তাদের কাগুজে প্রকাশ তখন কেন আমাদের এই প্রচেষ্টা: প্রশ্ন উঠতেই পারে। উত্তরটা সহজ। এই প্রকাশনা কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় কিছু কাগুজে পাতা, রঙচঙে ছবি, বাংলা হরফে লেখা গল্প, কবিতা বা নিছক স্বাস্থ্য-বটিকা নয়: এই ম্যাগাজিন বাংলাদেশী সমপ্রেমী জনগণের আত্মপ্রকাশের একটি প্রামাণ্য দলিল। রূপবান বলতে চায় যে আমরা কেবল অনলাইনে ভেসে বেড়ানো কিছু ইতস্তত কামপ্রবণতা নই, আমরা স্পষ্ট এবং বর্তমান। আমরা ছিলাম, আছি এবং থাকবো।

আমরা বাংলাদেশী, আমরা সমপ্রেমী। রূপবান বাংলাদেশী: রূপবান মানেই সমপ্রেমী।

প্রেম সার্বজনীন, সার্বজনীন লৈঙ্গিক পরিচয় এবং শারিরীক চাহিদাও। রূপবান এই সকল রকম প্রেম এবং চাহিদাজনিত বৈচিত্র্যতাকে শ্রদ্ধা করে। রূপবান তাই সমপ্রেমের কথা বলবে, রূপবান বলবে প্রেমে সমান অধিকারের কথা।

'রূপবান' নামটা কেমন যেন- অনেকেই জানতে চেয়েছেন। সত্যিই তাই। শব্দটি পুরুষবাচক অথচ শুনলে আমাদের মননে ভেসে ওঠে এক নারী-প্রতিচ্ছবি; ভেসে ওঠে রহিম বাদশা ও রূপবানের অসম বয়সী প্রেমের লোক কাহিনী। সেই লোক কাহিনী আমাদের ভাবতে শেখায় প্রেমের বৈচিত্র্যতার বিষয়ে। প্রেম কি কোনো সূত্র বা সংস্কার মানে? মানুষের যৌন প্রবৃত্তি কি তার সমাজ সৃষ্ট লৈঙ্গিক পরিচয় দিয়ে সীমাবদ্ধ? আমাদের সমাজসিদ্ধ সব কর্মই কি প্রাকৃতিক?

রূপবান চায় সমাজ সৃষ্ট লিঙ্গ পরিচয়ের এই শেকলকে ভাঙতে; রূপবান চায় প্রেমের অসমতার বিষয়টিকে সমাজের সামনে তুলে ধরতে। রূপবান বলতে চায় প্রেম অসম, সম, বিসম বা প্রতিসম হয়না, প্রেম শুধুই প্রেম হয়: কেবল সুষম প্রেমই পৃথিবীর জন্য স্বাস্থ্যকর। কেবল প্রেমই পারে মর্ত্যের পৃথিবীতে স্বর্গের সুখ এনে দিতে।

প্রকাশক
মুমন

সম্পাদক
রাসেল

লোগো
হৃদয়

ডিজাইন
মাহদী

প্রদায়ক
অভিজিৎ
অন্তর
তানভীর
কার্শ্যা কায়া
মুমন
মিনার
নয়ন
রাজীব
রাসেল
শাতীল

উপদেষ্টা
তানভীর
মুমন
মিশা
রাসেল
শুভ্র

আলোকচিত্র
পরাগ
মুমন

ইলাস্ট্রেশন
তানভীর

বিপণন
মিশা

প্রচার
রউফ

ভালোবাসতে দাও মোরে

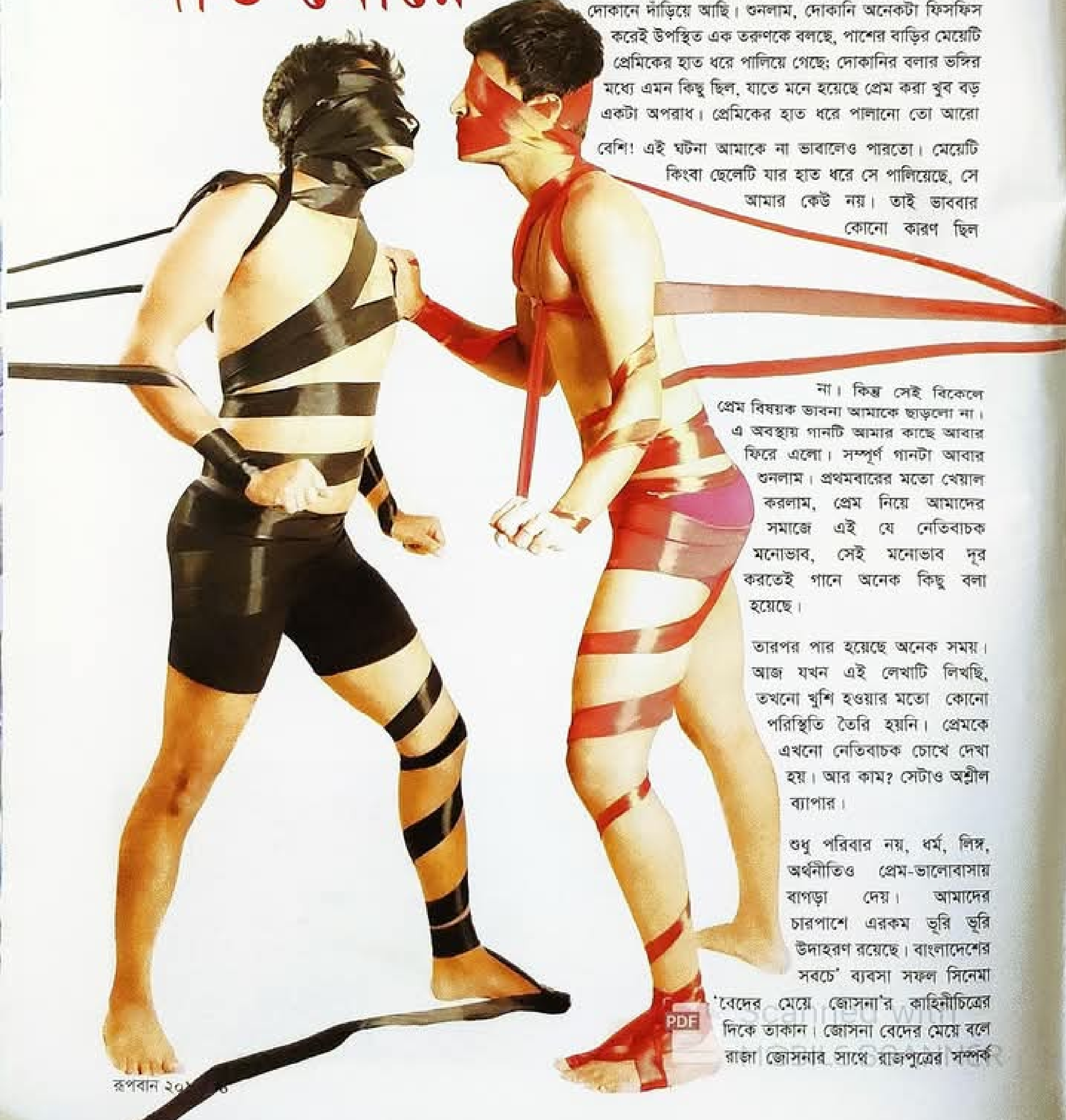

খুব ছোটবেলার কথা। স্কুলে পড়ি। পড়া আর খেলার বাইরে আর কোনো জগৎ গড়ে উঠেনি তখনো। একদিন স্কুল থেকে ফিরতে ফিরতে শুনি এক রিক্সাওয়ালা গাইছে-

প্রেমের মরা জলে ডোবে না...
তুমি সুজন দেইখা কইরো পিরিত...।

তখন বুঝিনি এই গানের মর্ম। তবে গানটা মনের কোথাও রয়ে গিয়েছিল বোধহয়। পরে আরো অনেকবার শুনেছি রেডিও-তে, এর-ওর মুখে। ওই পর্যন্তই। কিন্তু একটি ঘটনা সহসাই একদিন হঠাৎ অস্থিমজ্জাসহ গানটিকে নিয়ে এলো আমার কাছে। সেদিন বিকেলে মোড়ের চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে আছি। শুনলাম, দোকানি অনেকটা ফিসফিস করেই উপস্থিত এক তরুণকে বলছে, পাশের বাড়ির মেয়েটি প্রেমিকের হাত ধরে পালিয়ে গেছে; দোকানির বলার ভঙ্গির মধ্যে এমন কিছু ছিল, যাতে মনে হয়েছে প্রেম করা খুব বড় একটা অপরাধ। প্রেমিকের হাত ধরে পালানো তো আরো বেশি! এই ঘটনা আমাকে না ভাবালেও পারতো। মেয়েটি কিংবা ছেলেটি যার হাত ধরে সে পালিয়েছে, সে আমার কেউ নয়। তাই ভাববার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু সেই বিকেলে প্রেম বিষয়ক ভাবনা আমাকে ছাড়লো না। এ অবস্থায় গানটি আমার কাছে আবার ফিরে এলো। সম্পূর্ণ গানটা আবার শুনলাম। প্রথমবারের মতো খেয়াল করলাম, প্রেম নিয়ে আমাদের সমাজে এই যে নেতিবাচক মনোভাব, সেই মনোভাব দূর করতেই গানে অনেক কিছু বলা হয়েছে।

তারপর পার হয়েছে অনেক সময়। আজ যখন এই লেখাটি লিখছি, তখনো খুশি হওয়ার মতো কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। প্রেমকে এখনো নেতিবাচক চোখে দেখা হয়। আর কাম? সেটাও অশ্লীল ব্যাপার।

শুধু পরিবার নয়, ধর্ম, লিঙ্গ, অর্থনীতিও প্রেম-ভালোবাসায় বাগড়া দেয়। আমাদের চারপাশে এরকম ভূরি ভূরি উদাহরণ রয়েছে। বাংলাদেশের সবচে' ব্যবসা সফল সিনেমা 'বেদের মেয়ে জোসনা'র কাহিনীচিত্রের দিকে তাকান। জোসনা বেদের মেয়ে বলে রাজা জোসনার সাথে রাজপুত্রের সম্পর্ক

Scanned with PDF Scanner

মেনে নেন না। কিন্তু সিনেমার শেষে গিয়ে যখন আবিষ্কার হয় জোসনা কাজীর মেয়ে, তখন রাজার আর মেনে নিতে আপত্তি থাকে না। আপনি বলতে পারেন, এটা সিনেমা, বিনোদনের বাইরে এর মূল্য কী? আমি বলব, প্রায় সবার অলক্ষ্যে থেকে যাওয়া এই 'সামান্য' বিষয়টি আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় প্রেম-ভালোবাসার ব্যাপারে সামাজিক অবস্থান হেলাফেলার বিষয় নয়। কালে কালে এটাকে গুরুত্বের সাথে দেখা হয়েছে, হবে। সিনেমাটির নির্মাতা সেই বিষয়টির সফল চিত্রায়ন করেছেন। সিনেমা সুপারহিট হয়েছে।

এবার টানা যাক একটু 'অন্যরকম' প্রেমের উদাহরণ। এর নাম সমপ্রেম। আর সব প্রেমকাহিনীর মতোই এতে আছে দুটি চরিত্র। কিন্তু উপরোক্ত সব প্রেমের মতো এখানে পাত্র-পাত্রী নয়; দুজন পাত্র-পাত্র কিংবা পাত্রী-পাত্রী। এই প্রেমকে সমাজ বাঁকা চোখে দেখে বললে কম বলা হবে; সমাজের কাছে 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ' এই প্রেম ঘোরতর পাপ; কঠিন এক ব্যাধি। দেশে বিদেশে সব সমাজেই সমপ্রেমীদের কমবেশি বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছে, হচ্ছে। খুঁজলে আমাদেরই এমন অনেক বন্ধু-বান্ধবী পাওয়া যাবে যারা নিজেরা প্রেম করে পালিয়ে বিয়ে করেছেন কিন্তু দুটো ছেলের বা মেয়ের মধ্যে প্রেমের কথা শুনলে তারা আঁতকে উঠেন। অনেকে সমপ্রেমীদের গালাগালি পর্যন্ত করেন। অনেকে আবার মানসিক রোগী বানিয়ে দেন তাদের। প্রগতিশীল বলে দাবিদার অনেকের মধ্যেও সমপ্রেম নিয়ে রয়েছে নানান ওজর আপত্তি।

এদের অনেকেই হয়ত জানেন না বা জেনেও না বোঝার ভান করেন যে তথাকথিত 'স্বাভাবিক' প্রেমের মতো সমপ্রেমও পবিত্র, খাঁটি, আবেগময়। দুটো ছেলের বা মেয়ের নিজেদের মধ্যে প্রেমের এই তীব্র আকুতি আমাদের অনেকের কাছেই অবোধগম্য। সোজা কথায়, সমাজের তৈরি করে দেয়া সম্পর্কের রাস্তায় না হেঁটে সমপ্রেমীরা যে ভিন্ন পথ বেছে নেন তাতেই ঘটে যত বিপত্তি।

সমপ্রেম নিয়ে সমালোচনার ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় সবচে' বেশি চোখে পড়ে, তা হলো সমাজ বা ধর্মের দোহাই দিয়ে সমকামকে ব্যভিচারের সাথে আমরা গুলিয়ে ফেলি। কাম, আপাতদৃষ্টিতে যা অবাচ্য, অকথ্য, একান্ত গোপনীয়, তা হয়ে ওঠে অচ্ছুত, পাপাচার, ঘৃণ্য।

কিন্তু সমপ্রেম আর ব্যভিচার এক নয়। দুটি ভিন্ন বিষয়। সমপ্রেমীরা একজনের প্রতি নিষ্ঠ থাকেন। আমাদের 'স্বাভাবিক' জগতের প্রেমিক-প্রেমিকার মতো একজনের সঙ্গেই প্রেম করে সারাজীবন কাটিয়ে দিতে চান। অবাধ যৌনাচার তাদের উদ্দেশ্য নয়। অনেকে আবার সমপ্রেমকে তুলনা করেন শিশুকাম বা ধর্ষকামের সাথে। কিন্তু প্রেম কখনো যে দু'পক্ষের অনুমতি ছাড়া হয় না, সেটা তারা বোধহয় জানেন না। কিংবা জানলেও ভুলে যান।

শুধু আমরা সাধারণ মানুষেরাই নই, আমাদের রাষ্ট্র, আমাদের মিডিয়াও মেনে নিতে পারে না সমপ্রেমীদের এই সম্পর্ককে। কয়েক মাস আগের পত্রিকা উল্টান। দুই তরুণীর বিয়ে বিষয়ক সংবাদ সব পত্রিকাতেই পাবেন। আমাদের সমাজ তাদের প্রেমকে মেনে নিতে পারেনি। রাষ্ট্রও মেনে নেয়নি; মেয়ে দুজনের একজনকে নারী পাচারকারী বানিয়ে হাজতে পুরেছে। আর মিডিয়া, যাদের আসলে বুদ্ধিবৃত্তির আধার হিসেবে গণ্য করা হয়, তারাও একে ভালো চোখে দেখেননি! একে 'নজীরবিহীন','অবিশ্বাস্য' বলে উল্লেখ করেছেন! যেন সমপ্রেম কোনোকালে কোথাও ছিল না! সেদিনই মাত্র পৃথিবীর ইতিহাসে এই অবিশ্বাস্য ঘটনাটি ঘটেছিল।

আজকে এই লেখার মধ্যে দিয়ে আমি পাঠকদের উদ্দেশ্যে একটি প্রশ্ন রাখতে চাই। সেটা হল, সমাজ বা রাষ্ট্র কি চাইলেই প্রেমের টুঁটি চেপে ধরতে পারে? বিশেষ করে সমপ্রেমের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্র, সমাজ বা ধর্ম কেন অযৌক্তিকভাবে বাঁধার দেয়াল তুলে দাঁড়াবে? আর সব প্রেমের মতোই, সমপ্রেমীরা যাই করেন, নিজেদের ব্যক্তিগত ঘেরাটোপের মধ্যে থেকে করেন। তারা নিজেদের নিজস্বতা বজায় রেখে নিজেদের মতো একটা সুখী জীবন যাপনের চেষ্টা করেন। ধর্ম, সমাজ বা প্রকৃতির দোহাই দিয়ে এই যে মানুষের ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলে ঢুকে পড়ার হুটহাট অভ্যাস, তা পাল্টাতে হবে আমাদের। দৃষ্টি প্রসারিত করে সবাইকে তাকাতে হবে মানবিক অধিকারবোধের দিকে। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের কারণে একজন সমপ্রেমীর জীবন কতটা বিষিয়ে উঠতে পারে তা নিয়ে চিন্তা করার সময় এসেছে। সমপ্রেমীরা আমাদেরই আপনজন, কাছের মানুষ, চেনাজানা লোকজন। পরিবার, পরিচিতজনরা তার প্রেমের পরিচয় পেলে তা কীভাবে নেবে- এই ভয়েই তাকে সবসময় তটস্থ থাকতে হয়! তারা কি তাকে ঘৃণার চোখে দেখবে? দূরে চলে যাবে? সেই দুশ্চিন্তা তার স্বাভাবিক জীবন যাপনকে করে তোলে দুঃসহ। একবার ভেবে দেখুন শুধুমাত্র আরেকজন মানুষকে ভালোবাসার অপরাধে তাকে পরিচিতজনেরা দূরে ঠেলে দিচ্ছে। কতটা কষ্টের হতে পারে বিষয়টা।

সম্প্রতি মিডিয়ায় সমকাম ও প্রেম বিষয়ে নানাধরনের লেখা এসেছে। বাংলাদেশের মানবাধিকার সংগঠন ও কর্মীরা এ নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছেন। তারা ভালোবাসার অধিকারকে 'মানবাধিকার' বলে উল্লেখ করছেন। আস্তে আস্তে হলেও দেশের বিচ্ছিন্ন সমপ্রেমী জনগণ সংঘবদ্ধ হচ্ছেন। একত্র হওয়ার ক্ষেত্রে ইন্টারনেট যে অসামান্য ভূমিকা রাখছে তা বলাই বাহুল্য। একই সাথে ফুঁসে উঠছে সমপ্রেমভীতিও। যার অনেকটাই এসেছে অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত ধারণা থেকে। অনেকে বলছেন সমপ্রেমীদের হত্যা করা উচিত! কিন্তু যারা এই কথা বলছেন, তারা কি একবারও ভেবে দেখেছেন, এই সমপ্রেমীরা বাইরের কেউ নয়। এরা আমাদের ঘরেই বাস করেন কারো ভাই, বোন কিংবা সন্তান হয়ে।

তাই আজ ভালোবাসার অধিকারের প্রশ্ন এসেছে। আমি কাকে ভালোবাসবো, কার সাথে ঘর করবো, এটা আমার নিজস্ব ব্যাপার! এখানে অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করে আমার জীবন বিষিয়ে তুলবে; কিংবা ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাবে তা হতে পারে না। আবার কেউ এসে আমার প্রেমকে সম, অসম, বিষম তকমা লাগিয়ে দিক, এটাও আমি চাই না। আমি চাই, আমার নিজের মতো করে যে কাউকে ভালোবাসতে। চাই ভালোবাসার এই অধিকারটুকু একান্তে আমার কাছে থাক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মানবাধিকারে বিশ্বাসী যে কোনো নাগরিকই আমার সাথে এই বিষয়ে একমত হবেন।

আমি আরো বিশ্বাস করি যে, যত বাঁধাই থাকুক না কেন, প্রেম-ভালোবাসার ক্ষেত্রে যেসব বাঁধা-বিপত্তির কথা এতক্ষণ বলা হলো, সেগুলোও একদিন ফিকে হয়ে আসবে। গরিব ঘরের ছেলের হাত ধরে পালিয়ে যাওয়ার ধনীর দুলালির বাবা-মাও একদিন সম্পর্ক মেনে নিয়ে জামাইকে বরণ করে নেন। ঈদ উৎসবে কিংবা বিভিন্ন পালা-পার্বণে দাওয়াত করে এনে ভালো-মন্দ খাওয়ান। সমপ্রেমী সন্তানকেও বাবা মা আত্মীয়-স্বজনেরা দূরে ঠেলে না দিয়ে বোঝার চেষ্টা করবেন। তাদের সবার সমর্থন, সহায়তা ও ভালোবাসার কাছে সমাজও হার মানতে বাধ্য হবে। একদিন সমপ্রেমও স্বীকৃতি পাবে। ■

Scanned with MOBILE SCANNER

রমনায়
একদিন

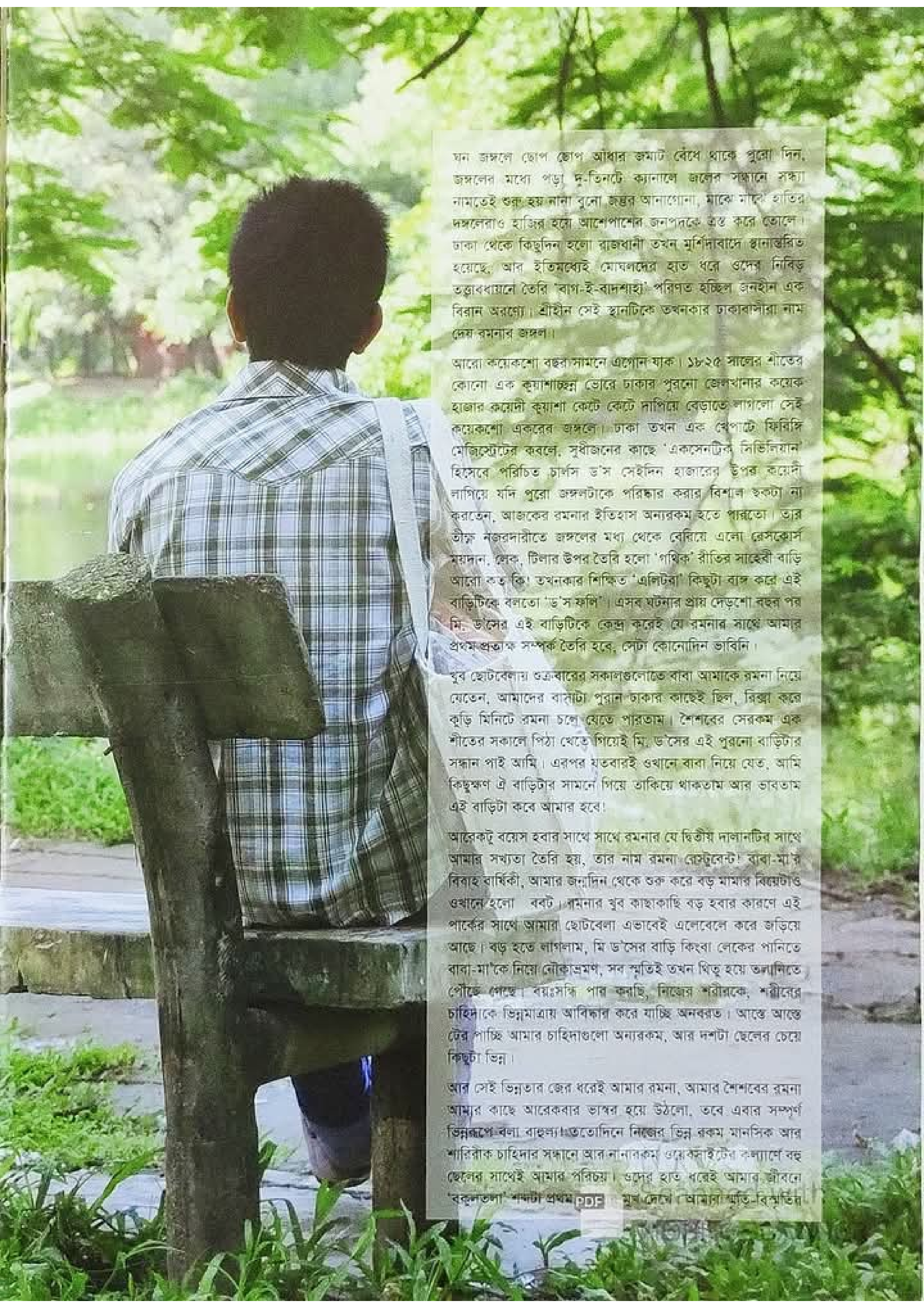

ঘন জঙ্গলে ঝোপ ঝোপ আঁধার জমাট বেঁধে থাকে পুরো দিন, জঙ্গলের মধ্যে পড়া দু-তিনটে ক্যানালে জলের সন্ধানে সন্ধ্যা নামতেই শুরু হয় নানা বুনো জন্তুর আনাগোনা, মাঝে মাঝে হাতির দঙ্গলেরাও হাজির হয়ে আশেপাশের জনপদকে ত্রস্ত করে তোলে। ঢাকা থেকে কিছুদিন হলো রাজধানী তখন মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়েছে, আর ইতিমধ্যেই মোঘলদের হাত ধরে ওদের নিবিড় তত্ত্বাবধায়নে তৈরি 'বাগ-ই-বাদশাহী' পরিণত হচ্ছিল জনহীন এক বিরান অরণ্যে। শ্রীহীন সেই স্থানটিকে তখনকার ঢাকাবাসীরা নাম দেয় রমনার জঙ্গল।

আরো কয়েকশো বছর সামনে এগোন যাক। ১৮২৫ সালের শীতের কোনো এক কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরে ঢাকার পুরনো জেলখানার কয়েক হাজার কয়েদী কুয়াশা কেটে কেটে দাপিয়ে বেড়াতে লাগলো সেই কয়েকশো একরের জঙ্গলে। ঢাকা তখন এক খেপাটে ফিরিঙ্গি মেজিস্ট্রেটের কবলে, সুধীজনের কাছে 'একসেনট্রিক সিভিলিয়ান' হিসেবে পরিচিত চার্লস ড'স সেইদিন হাজারের উপর কয়েদী লাগিয়ে যদি পুরো জঙ্গলটাকে পরিষ্কার করার বিশাল হুকুম না করতেন, আজকের রমনার ইতিহাস অন্যরকম হতে পারতো। তার তীক্ষ্ণ নজরদারীতে জঙ্গলের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো রেসকোর্স ময়দান, লেক, টিলার উপর তৈরি হলো 'গথিক' রীতির সাহেবী বাড়ি আরো কত কি! তখনকার শিক্ষিত 'এলিটরা' কিছুটা ব্যঙ্গ করে এই বাড়িটিকে বলতো 'ড'স ফলি'। এসব ঘটনার প্রায় দেড়শো বছর পর মি. ড'সের এই বাড়িটিকে কেন্দ্র করেই যে রমনার সাথে আমার প্রথম প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তৈরি হবে, সেটা কোনোদিন ভাবিনি।

খুব ছোটবেলায় শুক্রবারের সকালগুলোতে বাবা আমাকে রমনা নিয়ে যেতেন, আমাদের বাসাটা পুরান ঢাকার কাছেই ছিল, রিক্সা করে কুড়ি মিনিটে রমনা চলে যেতে পারতাম। শৈশবের সেরকম এক শীতের সকালে পিঠা খেতে গিয়েই মি. ড'সের এই পুরনো বাড়িটার সন্ধান পাই আমি। এরপর যতবারই ওখানে বাবা নিয়ে যেত, আমি কিছুক্ষণ ঐ বাড়িটার সামনে গিয়ে তাকিয়ে থাকতাম আর ভাবতাম এই বাড়িটা কবে আমার হবে!

আরেকটু বয়েস হবার সাথে সাথে রমনার যে দ্বিতীয় দালানটির সাথে আমার সখ্যতা তৈরি হয়, তার নাম রমনা রেস্টুরেন্ট! বাবা-মা'র বিবাহ বার্ষিকী, আমার জন্মদিন থেকে শুরু করে বড় মামার বিয়েটাও ওখানে হলো বৈকি। রমনার খুব কাছাকাছি বড় হবার কারণে এই পার্কের সাথে আমার ছোটবেলা এভাবেই এলেবেলে করে জড়িয়ে আছে। বড় হতে লাগলাম, মি ড'সের বাড়ি কিংবা লেকের পানিতে বাবা-মা'কে নিয়ে নৌকাভ্রমণ, সব স্মৃতিই তখন থিতু হয়ে তলানিতে পৌঁছে গেছে। বয়ঃসন্ধি পার করছি, নিজের শরীরকে, শরীরের চাহিদাকে ভিন্নমাত্রায় আবিষ্কার করে যাচ্ছি অনবরত। আস্তে আস্তে টের পাচ্ছি আমার চাহিদাগুলো অন্যরকম, আর দশটা ছেলের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন।

আর সেই ভিন্নতার জের ধরেই আমার রমনা, আমার শৈশবের রমনা আমার কাছে আরেকবার ভাস্বর হয়ে উঠলো, তবে এবার সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে বলা বাহুল্য। ততোদিনে নিজের ভিন্ন রকম মানসিক আর শারিরীক চাহিদার সন্ধানে আর নানানরকম ওয়েবসাইটের কল্যাণে বহু ছেলের সাথেই আমার পরিচয়। ওদের হাত ধরেই আমার জীবনে 'বকুলতলা' শব্দটা প্রথম PDF মুখ দেখে। আমার স্মৃতি-বিস্মৃতির

রমনা তখন শব্দ সংক্ষেপে আরপি! সন্ধ্যার পরে বকুলতলার অল্প আলো আর সুবিস্তৃত অন্ধকারে পুরো শহর থেকে বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপের সেই স্বল্প পরিসরের গল্পই আজ শোনাবো আপনাদের। রমনা কি কেবল মানসিক আর শারিরীক আবেগ প্রকাশের এক অভয়ারণ্য নাকি কামাচারে পূর্ণ অত্যাধুনিক গোপন এক 'সোডম' নগরী! চলুন দেখি!

বুদ্ধদেব বসু গত শতকের ত্রিশের দশকে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, রমনার দক্ষিণ পাশটা তখন একেবারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কবজায়। সেসময় প্রত্যেক শনিবারের অপরাহ্নে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আর অধ্যাপকদের মুখে ধুলো উড়িয়ে জুয়াড়ী আর বেশ্যায় ভরা কিছু খড়খড়ি ছুটে চলতো রমনার রেসকোর্সে তৈরি সাহেবদের বাড়িগুলোর দিকে। রমণের সেই অতীত ঐতিহ্যের অনেকটাই যেন বুক ফুলিয়ে টিকে আছে বকুলতলার মৃদু আলো-অন্ধকারে। ছায়ানটের বর্ষবরণের রমনা, পিঠা-পার্বণ কিংবা দ্বিজেন শর্মার 'গেছো' রমনা সন্ধ্যা নামতেই ভোল পাল্টিয়ে ধারণ করে অন্য রূপ।

মি. ডাসের ছেড়ে দেয়া সেই হাজারখানেক কয়েদী কিংবা হাতির দঙ্গল নয়, এই একুশ শতকে সান্ধ্য আঁধারে একজন দুইজন করে আনাগোনা বাড়তে থাকে কিছু সন্ধানী লোকের। পার্কের মৃদু নিয়ন আলোয় এরা ধীর লয়ে হাঁটে, শিকারীর মতো সন্ধানী চোখে তাকায় আর যখনি বুঝবে আপনিও তার মতোই, তখন তাকিয়েই থাকে, যেন সম্মোহিত করবার অবিরাম প্রচেষ্টা। পার্কের কিছু নির্দিষ্ট জায়গা ছাড়াও পুরো পার্ক জুড়েই তাদের ইতস্তত কিছু ছায়ার সঞ্চালন যেন রক্তমাংশের কায়াকেও ছাড়িয়ে যায়। নির্দিষ্ট যৌন এবং মানসিক প্রবৃত্তি সম্পন্ন কিছু মানুষ এরা, এরাই আমাদের কলিযুগের রূপবান! মূলত বকুলতলা নামক রমনা পার্কের আলো-আঁধারিযুক্ত একটি নির্দিষ্ট স্থানে সন্ধ্যার পরে এভাবেই সম-চাহিদাসম্পন্ন কিছু মানুষ জড়ো হতে থাকে। নিজেদের মতো একই চাহিদাসম্পন্ন অন্য রূপবানদের চিনে নেবার জন্য এরা তৈরি করে নিয়েছে কিছু শারিরীক ভাষা। কাউকে ভালো লাগলে তার সাথে সাথে হাঁটা, চোখের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকা কিংবা আগ বাড়িয়ে পরিচিত হতে আসা এখানকার নিত্য চিত্র। তারপর কি হয়? কেউ ফোন নাম্বার নেয়, কেউ বাড়ি নিয়ে যায়, আবার কেউ ওখানেই যা ভালো লাগে করে নেয়। আলো-আঁধারির অপার্থিব বাস্তবতা এই আপাত অস্বাভাবিক আচরণগুলিকে যেন অনেকটাই সহজ করে তোলে। কেউ দেখে ফেললে কি হবে? আপাতত যারা ওখানে জগিং করতে যায়, পার্কের পথচারী অথবা ভিতরের গার্ড, তারা সকলেই কম বেশি এই কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে অবহিত আছেন। গার্ডেরা হফতার বিনিময়ে কিংবা মাঝে মাঝে নিজেরাই এই 'সোডম' নগরে হারিয়ে গিয়ে পুরো ব্যাপারটাকে চেপে যান। তবে যৌনতাই কি এই স্থানের একমাত্র পরিচয়? আমার শৈশবের রমনার সাথে এই বাস্তবতার দ্বন্দ্বটা কেবল আমাকে একা নয়, একইরকম ভিন্নমার্গীয় ভাবধারার আরো অনেককেই হয়তো ভাবায়। সেই বাস্তবতা অনুসন্ধানের চেষ্টা থেমে থাকেনি এই প্রতিবেদন তৈরির সময়টিতেও।

রমনায় আমাদের কথা হয় অমিত, সুজন আর পল্লবের সাথে। তারা তিনজন বন্ধু, তাদের এই ত্রয়ী বন্ধুত্বের সূচনা আজ প্রায় দীর্ঘ বারো বছর। সুদীর্ঘ সময়ে পরস্পরকে চিনে নেবার পথটি তারা পাড়ি দিয়েছেন রমনাতেই। "আমার প্রথম দিককার আরপি বন্ধু বলতে পল্লব আর সুজন। আস্তে আস্তে এত কাছাকাছি এসেছি যে ওরা এখন আমার পরিবারেরই একটা অংশ", বলছিলেন অমিত। অন্য দুজনের গল্পটাও ভিন্ন কিছু নয়। তারা নিয়মিত এখনো রমনাতে আসেন। কেন আসেন এতদিন যাবৎ এমন প্রশ্নের জবাবে সুজন বললেন,"নিজের মতো আর পাঁচ জনকে খুঁজতেই এসেছিলাম, 'সেক্স' করাটাও একটা কারণ। তবে এতদিন এখানে আসতে আসতে এই জায়গাটা এখন নিজের পরিচয়ের অংশ বলেই ভাবি। ছুটির দিনগুলো বা উৎসবে এখানকার বন্ধুদের সাথে দেখা না হলে নিজেরই খারাপ লাগে।" হাঁটতে হাঁটতেই পরিচয় হয়ে গেল আরেকটি ঘুরতে আসা বড় দলের সাথে। তাদের সাথে কথা বলার এক পর্যায়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আরপি কেন আসেন?" উত্তরে বোঝা গেল ঢাকার রূপবানদের সর্ববৃহৎ এই মিলনস্থলের কোনো উপযুক্ত পরিপূরক এখনো [illegible] হয়নি। অন্তর্জালের বাইরে সরাসরি মানুষের

Scanned with
MOBILE SCANNER

সাথে দেখা করবার জন্য অভিনবত্ব আর প্রাচীনত্বের এক অপূর্ব মিশেলের নাম আরপি।

কতদিন থেকে রমনায় এমন যাতায়াত শুরু করেছে ঢাকার রূপবানরা, তার পরিষ্কার কোনো ইতিহাস কোথাও নেই। কথা বলে অনুমান করা যায় আশি-এর দশক থেকেই এর শুরু আর ৯০ তে সেটা পূর্ণতা পায়। ইন্টারনেটহীন সেই সময়টাতে ঢাকার রূপবানদের সবরকম শারিরীক আর মানসিক চাহিদা মেটাতে এখানেই আসতে হত। চাহিদাজনিত নানারকম ভিন্নতার জের ধরেই 'কতি', 'পাস্থী' জাতীয় শব্দ প্রথম তৈরি হয় রমনাতে যা এখন সমগ্র বাংলাদেশে প্রচলিত।

সন্ধ্যায় রমনার বিভিন্ন এলাকায় হাঁটার সময় চোখে পড়বে বিভিন্ন বয়েসী নানারকম দঙ্গল, ইঙ্গিতসূচক গান আর চাহনী। পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় স্পর্শ কিংবা চাহনী এখানে একইরকম প্রবৃত্তি সম্পন্ন মানুষদের পরস্পরকে চিনে নিতে সাহায্য করে। তবে কেউ কারোর সাথে অপ্রীতিকর কিছু করে না সাধারণত। কেবল যৌনতা মাথায় নিয়েই যে সবাই ঘুরে তা নয়, কি ঘটছে এখানে শুধুমাত্র সেটা দেখবার জন্যেও অনেকে রমনায় ঢুঁ মারেন মাঝে মাঝে। বন্ধুদের সাথে নিয়ে ঘুরতে আসা এরকম অনেক দলই দেখতে পাবেন রমনায় হাঁটার সময়।

নানারকম ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণের কারণে 'বন্ধু সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি' এরকম স্থানগুলোতে কাজ করছেন বিগত বেশ কয়েক বছর ধরেই। এই এলাকায় তাদের সরাসরি আট জন মাঠকর্মী আছেন। বন্ধু এর মতে অন্যান্য রাত্রিকালীন স্থানগুলির চাইতে রমনার চিত্র অনেকটাই ভিন্ন। প্রথমত এটি ঢাকার রূপবানদের সবচাইতে পুরনো স্থানগুলির একটি। এর বিস্তৃতি যেমন বড় তেমনি বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ এখানে জড় হন। সবাই তাদের চাহিদানুযায়ী লোকদের সাথে কথা বলা কিংবা বোঝাপড়া করতে পারেন। এখানকার সবচেয়ে ভালো দিকগুলোর মধ্যে একটি হলো রাত্রিকালীন স্থান হলেও এখানে ছিনতাই কিংবা নিরাপত্তাজনিত সমস্যা খুবই কম। বন্ধুর তরফ থেকে এখানে প্রয়োজনীয় কন্ডম এবং স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হয়।

সপ্তাহের প্রতিদিনই এখানে বিভিন্ন বয়েসী রূপবানেরা আসেন, তবে শুক্রবার আর ছুটির দিনগুলিতে এর পরিমাণ হয় সবচেয়ে বেশি। হাঁটা, দাঁড়িয়ে থাকা আর কথা বলার মধ্য দিয়ে তৈরি হয় সখ্যতা। অনেকের ক্ষেত্রে এরকম সম্পর্ক প্রেমে গিয়েও গড়িয়েছে। কথা হয়েছিল এমন এক জুটি মেহেদি এবং রনির সাথে। প্রথম দিকে রমনার ব্যাপারে প্রচণ্ড নাক উঁচু মেহেদীর সাথে রনির পরিচয় হয় ২০০৮-এর শেষের দিকে, রনি তখন কেবলমাত্র চারুকলার প্রথম বর্ষের ছাত্র। সেই সম্পর্ক এখন গড়িয়েছে প্রায় পাঁচ বছরের অটুট ভালোবাসার বন্ধনে। এখানে এসে বন্ধুত্ব কিংবা ভালোবাসার এরকম উদাহরণ আরো রয়েছে, আর সেই সাথে রয়েছে রমনা নিয়ে 'অচ্ছুত' দৃষ্টিভঙ্গিও। বাংলাদেশের সমকামীদের সবচেয়ে উন্মুক্ত এই চারণভূমি সম্পর্কে কম বেশি সব রূপবানদেরই জানা আছে। এদের বিরাট একটি অংশেই রমনা কিংবা এখানকার যৌনতার সরল পাঠ নিয়ে অবজ্ঞাসূচক মনোভাব পোষণ করেন। অনলাইন আর ইন্টারনেটে আমরা যা হরহামেশাই করছি, সমাজের শিখিয়ে দেয়া শুদ্ধাচার পাঠে এখানে যৌনতার সহজ প্রকাশ আমাদের নাক কুঁচকে দেয়। আমাদের সেই ঘৃণা আর শুদ্ধাচারবোধ রমনার বকুলতলার অন্ধকারকে যেন আরো ঘনীভূত করছে প্রত্যেকদিন। এখানে যারা যায়, তাদের প্রত্যেকের চোখে কামের গভীরে লুকিয়ে থাকা অপরাধবোধ এদের তীব্রভাবে তাড়া করে ফেরে, নিয়নের প্রতারিত আলোয় এরা তাই নিজেদের আরো লুকিয়ে ফেলতে চায়। যৌনতা তাদের কাছে কেবল উল্লাস নয়, অপরাধও বটে, আর সেই অপরাধবোধের হাত ধরেই আরো অসংলগ্ন যৌন আচরণ, মানসিক এবং শারিরীক স্বাস্থ্যঝুঁকি বেড়েই চলছে রমনায়। যারা ওখানে হাঁটতে গিয়ে কিংবা পাশের কাকরাইল মসজিদে বসে এসব দেখেও না দেখার ভান করে আছেন, তারা যেন বকুলতলার বাস্তবতায় একটা আস্ত সমাজ। এরা জানে ঐ জায়গাটুকু কেবল পাপের কামে পূর্ণ, এরা জানে ঐ জায়গাটুকু তাদের যৌনতার অশুদ্ধ অংশ, আর তাই এরা বকুলতলায় আলো পড়তে দিতে চায় না, এরা চায় না বকুলতলার গণ্ডি অন্ধকার পেরিয়ে তাদের শুদ্ধ সমাজে প্রবেশ করুক, সবকিছু দেখেও সমাজ হয়তো তাই না দেখার ভান করে থাকতে পারে কারণ তারা খুব সফলভাবেই এই ভিন্নরকম প্রবৃত্তিকে বকুলতলার আস্তাকুঁড়ে ছুড়ে ফেলতে পেরেছেন, সীমানা এঁকে দিয়েছেন এর বাইরে বের না হবার। অথচ পৃথিবীর আরো অনেক দেশে এরকম জায়গাগুলিই হয় সবচেয়ে আলোকিত, এখানে পা ফেলতে তাদের কোনো অন্ধকারের সহায় নিতে হয় না, নিজের চাহিদাকে আলোর মতোই উদযাপন করতে পারে তারা। তাই আজ সময় এসেছে হয়তো আরেকবার ভেবে দেখবার, আমরা নিজেরাও কি সেই শুদ্ধ সমাজের অংশ হয়ে রমনাকে, এর আচরণকে তাচ্ছিল্য আর অবজ্ঞা করে যাচ্ছি না প্রত্যেকদিন? রমনা কিংবা বকুলতলায় যাওয়া মানুষদের নিয়ে ঠাট্টা করবার আগে আমরা কি আরেকবার ভেবে দেখতে পারি?

হয়তো সময় এসেছে!

জুনের সকালটা

সেদিন সকালটা ঠেসে উপচে পড়ছিল উত্তেজনায়, আজ ঠিক সোয়া নয়টায় ঘুম থেকে উঠে যেমন আকাশ, মেঘ আর বারোয়ারি শব্দে চারপাশ মুখর ছিল, সেদিন সারারাত ঠিকমতো ঘুমোতে না পারা সকালটাও এর চেয়ে ভিন্ন কিছু ছিল না। তবে সময়টা অস্থির ছিল, শুধু দুদিন আগে বিরোধী দলের ডাকা পরপর দুটো হরতাল কিংবা কয়েকদিনের জুনের টানা বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়া ঢাকা নয়, সেই বয়সে কিছু আগুন ছিল, যার কাঁচাপাকা উত্তাপ সময়ের এই প্রান্তে বসেও টের পাই আমি।

কথা ছিল দুজনের হাতে দুটো চিঠি থাকবে। আজ, এখন বসে সেসব ভাবলে বিবস লাগে! ঠিক চিঠির যুগের ছেলে নই আমি, ততোদিনে ইমেইল, ফেসবুকে মনোজগত ভেসে না গেলেও ছিল এসএমএস, ছিল মোবাইলে সস্তায় এফএনএফ-এর ছড়াছড়ি। তবুও চিঠির ব্যাপারটা বাস্তবে গড়ায় ওর নিজের চিঠি পাবার ব্যক্তিগত পুরনো অভ্যাস আর আমার অপ্রাপ্ত বয়সের সীমাহীন উত্তেজনার সম্মিলনে। হুমায়ূনের নীল খামে পোরা চিঠির ফ্যান্টাসিতে বিভোর তখন আমার সদ্য কৈশোরে ভেড়া মন!

ঘড়ির কাঁটা সেদিন বাইরের আকাশের পুরু অন্ধকারের স্তূপকে সেকেন্ডে সেকেন্ডে পরিষ্কার করে চলছিল খুব ধীর গতিতে, যেন টিক টিক টিক শব্দের অবিরাম এক প্রবাহ রাতটাকে কুক্ষিগত করে রাখতে চায় অনন্তকাল। আমার মন তখন উলটো স্রোতে বইতে লাগে, গত কয়েকমাসের দানা বাঁধা সব কৌতুহল, যাকে প্রেম বলে চিনতে শিখেছে আমার 'টিনেজ' মনস্তত্ত্ব, তার অকূল পাথারে ভেসে যাই, ডুবে যাই নিরন্তর। কত ভয়, আশা, শঙ্কা আর অস্থিরতা ঠাঁই করে নিয়েছিল এ[illegible]তর জুনের সেই রাতটায়!

Scanned with MOBILE SCANNER

কি পরেছিলাম সেদিন সকালে মনে পড়ছে না কিন্তু আশ্চর্য লাগে কি খেয়েছিলাম সেটা যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমি। মৃদু অন্ধকারে সেই প্লাই-উডের কালো টেবিলটার উপর থেকে লম্বা আধপাকা সাগর কলাটা নিঃশব্দে ছিড়ে নিল যে ছেলেটা, ফ্রিজ খুলে পাউরুটি বের করে সেই ঠাণ্ডা রুটিই কলা দিয়ে মুখে সেধোচ্ছে যে বালক, সে যেন এখনো আমার চোখের সামনে সেইদিনের পুরো সকালটা নিয়ে স্পষ্ট! কোথায় যাবো সেই অজুহাত আগের রাতেই দেয়া থাকায় শুক্রবারের সেই কঠিন সকালটায় কারোর ঘুম এতটুকু না ভাঙ্গিয়ে দরজাটা না লাগিয়েই চোরের মতো রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। পকেটের চিঠিটা তখন আমার বুকের উত্তেজনার সাথেই যেন তালে তাল মিলিয়ে কাঁপছে।

শুধু সময়টাই কি কাঁচা ছিল, অভিজ্ঞতা নয়? তখন কেবলমাত্র এক নতুন পাড়ায় পা পড়েছে যেখানে কিচ্ছু চিনি না, কাউকে বুঝি না। এমন একটা তালগোলের সময় কেউ যদি আমার পরীক্ষার রেজাল্ট কবে, বিকালে কি করি, কি বই পড়ি এসব জানতে চায়, তাকে আপন লাগাটা বাধ্যতামূলক ছিল বোধহয়। তার উপর সামনা সামনি দেখা হওয়া তৃতীয় ব্যক্তি, সব নতুন আর অচেনা তার মানে আমাকে বোবা সম্মোহনী শক্তিতে সবটাই টানবে,এটাই হবার কথা ছিল।

আসাদগেট পার করে আড়ং-এর কোণাটায় দাঁড়ালে এখনো ঐ নীল ছেলেটাকে দেখতে পাই আমি মাঝে মাঝে, আমার ঐ আগুন লাগা পুরো বয়সটা যেনো একটা বিচ্ছিন্ন মুহূর্তে ঠিক ঐ জায়গাটাতেই এসে আটকে গেছে। উড়ু উড়ু লালচে পাতলা চুল, ফর্সা লালচে সেই মুখ আর গায়ের নীলচে সেই জামাটা, আমার কেবল পনেরোতে পড়া সেই বয়সের সবটাই যেনো শুষে নিল সামনে দাঁড়ানো এক কৃষ্ণগহ্বর!

আসাদগেট পার করে আড়ং-এর কোণাটায় দাঁড়ালে এখনো ঐ নীল ছেলেটাকে দেখতে পাই আমি মাঝে মাঝে, আমার ঐ আগুন লাগা পুরো বয়সটা যেনো একটা বিচ্ছিন্ন মুহূর্তে ঠিক ঐ জায়গাটাতেই এসে আটকে গেছে। উড়ু উড়ু লালচে পাতলা চুল, ফর্সা লালচে সেই মুখ আর গায়ের নীলচে সেই জামাটা, আমার কেবল পনেরোতে পড়া সেই বয়সের সবটাই যেনো শুষে নিল সামনে দাঁড়ানো এক কৃষ্ণগহ্বর! আমরা হাঁটছিলাম, হেঁটে হেঁটে ধানমন্ডি লেকের ঐ ব্রিজটায় ওঠার পর প্রত্যাশিত বৃষ্টি যখন ওর নীল শার্টে গাড় আলপনা তৈরি করছিল, আমি তখনো হয়তো টের পাইনি যে এই সময়গুলো আমার ভিতরে কিভাবে আটকা পড়ে যাবে। ঠিক এমন বৃষ্টি, নীল শার্ট আর লেক পেরনো ব্রিজটা যেন ত্রিকাল, এর ভিতরেই আটকে গেছে সবটা, এর বাইরে এমন মুহূর্ত, এমন অনুভূতিতে আর দ্বিতীয়বার তৈরি হবে না। আমরা বসলাম, হাঁটলাম, কথা বললাম, তেহারীর সস্তা দোকানটায় বসে দুপুর হবার আগেই খেয়ে নিলাম, ঐ

ছেলেটার হাতে হাত রাখলাম। হাত রাখা, কারোর হাতে হাত রাখাটা যে এতোটা শরীর জাগানিয়া হতে পারে, আগে টের পাইনি কোনদিন! এরপরেও বহুবার ইচ্ছা করেই অন্য লোকের হাত ধরেছি ওরকম হবে ভেবে, হয়নি! সমস্তটাই ছেলেমানুষী বলা বাহুল্য!

কয়েকদিন বাদে আমার এসএসসি-এর রেজাল্ট ছিল, এমন সময়ে জুম্মা কামাই দেবার অর্থ হলো ঘোর পাপ! সোবহানবাগের মসজিদের সামনে এসে আমার ধর্মবোধ তখন টনটনে। ওকে বললাম, আমার সাথে নামাজে ঢুকতে, সে নামাজ পড়ে না স্পষ্ট করে দিয়ে আমাকে যেতে বলল। আমি যাচ্ছিলাম, একবার ডাক দিল, ওর চিঠিটা বের করে আমার হাতে দিয়ে আমারটা কই জিজ্ঞাস করলো, আমি আমার খামটা ওর হাতে দিয়ে ওর চিঠির দিকে তাকিয়ে দেখি সেটা ভিজে ছিড়ে গেছে কিছুটা, দু এক জায়গায় অক্ষরে পানি লেগে নীল কালী চুইয়ে পড়েছে। সেটা সে অবস্থাতেই পকেটে পুরে দৌড়ে মসজিদে মানুষের ভীড়ে হারিয়ে গেলাম। চিঠিটা হারায়নি, এখনো যত্ন করে রাখা আছে আমার কাছে।

ঐদিন আরো অনেকবার বৃষ্টি হয়েছিল, আমি আমার পরিচিত গন্ডির ঢাকা পেরিয়ে অন্য অচেনা সব জায়গাতে হেঁটেছি অদ্ভুত উত্তেজনা নিয়ে, সন্ধ্যার অন্ধকারে পুরো দিনের সমস্ত উত্তেজনা গিয়ে মিশেছিল তোমার নরম ঠোঁটের গোড়ায়, আমার হাত ঘুরেছে সব অজানা অচেনা অলিতে গলিতে। ঝম ঝমে বৃষ্টি মাথায় রাত নটায় আমি যখন বাড়ি পৌঁছাই, এতো রাত অবধি বাইরে থাকার আজ্ঞা তখনো বাড়িতে জোটেনি আমার। তাতে কি, আমি তখন অন্য জগতে!

এরপর অনেক সময় কেটেছে, বয়ে গেছে বছর আর তার পিঠে আরো অন্যবছর। কাঁচাবাজারের জিনিসের দাম তখন অনেক বেড়েছে, বেড়েছে তোমার সাথে আমার সম্পর্কের দূরত্বও, বেড়েছে বয়সের সাথে পাল্লা দিয়ে অভিজ্ঞতা। কিন্তু সেই সকালটা, সেই দিনটা সবটাই আমার হয়ে আমার রক্তে মিশে গেছে। ঐ সকালটা আমার থেকে কখনো দূরে চলে যেতে পারেনি। ঠিক যেমন এসবের অনেক অনেকদিন পর তোমার দেয়া একটা মেসেজ আমাকে আজো তাড়ায় :

"প্রচণ্ড মাথা ব্যথা করছে, ঔষুধ খেয়ে লাইট নিভিয়ে ঘুমাতে চাইছি, কিন্তু পারছি না। আমার মনে হচ্ছে আমি সোবহানবাগের সেই মসজিদটার সামনে দাঁড়ানো আছি, অনেক লোকের ভিড়ে তুমি নামাজ পড়তে ভিতরে হারিয়ে গেলে, এরপর বছরের পর বছর পার হয়ে যাচ্ছে, তুমি বেরোচ্ছ না নামাজ শেষ করে। আমি ঠিক ঐখানটায় ওভাবেই [illegible] বৃষ্টিতে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি, তুমি আর কোনোদিন বেরোবে না জেনেও!" ■

Scanned with MOBILE SCANNER

অন্যরকম কিন্তু অস্বাভাবিক নয়

এদেশে কাক দেখেননি এমন কেউ আছেন? বোধ করি না। দাঁড়কাক কি পাতিকাক, ছোট কি বড়, বাচ্চা কিংবা বুড়ো, দেখেছেন বইকি। তবে যেমনটাই দেখুন না কেন রঙ কিন্তু কাল কিংবা কালচে। পথ চলতে চলতে হঠাৎ যদি সাদা রঙের কাক চোখে পড়ে? আঁৎকে উঠবেন? নাকি কাকটাকে ভিনদেশী বলে ধরে নেবেন। এটা কি অন্যরকম নাকি অস্বাভাবিক?

আমাদের দেশ জুড়ে কালচে বাদামী রঙের অনার্য মানুষের সমারোহ। কালো হলে কপাল মন্দ এদেশে, আর কপাল গুণে একটু ফর্সা হলেই তো জন্ম সার্থক, মেয়ে হলে তো ভালো ঘরে বিয়েটা পাকা। কিন্তু চলতি পথে যদি ধবল কাউকে নজরে পড়ে? আপন মনেই হয়তো নাক কুঁচকে উঠবে। ভাববেন এই অস্বাভাবিক সাদা হওয়ার কারণ কি।

পত্রিকা উল্টে খবর দেখলেন, অধিকার আদায়ে সমকামীরা! একটু ধার্মিক হলে নাউজুবিল্লাহ, সুশীল সমাজ হলে বলবেন অপ্রাকৃতিক। তার চাইতেও মজার ব্যাপার হলো অনেক সমকামীই ভাববেন, চেপে যা! সমাজে আমার কথা প্রকাশ হলে মুখ দেখাব কি করে! আর দশজন 'স্বাভাবিক' মানুষের ভীড়ে নিজেকে আলাদা করে প্রকাশের অবকাশ কোথায়!

কিন্তু 'স্বাভাবিকতা'র নির্ণায়ক কি? কোনটা প্রাকৃতিক আর কোনটা প্রাকৃতিক নয়? ধরুন সাদা কাকটির কথা, ত্বকের এক ধরনের রঞ্জকের অভাবে কাকটি তার গোত্রের রঙ ধারণ না করে সাদা হয়ে গেলো। কিংবা একজন ধবল মানুষ? সেও তো একই ভাগ্যের ফেরে সাদা হয়ে গেলো। ভাগ্য বলা ভুল, কারণটি আসলে জীনগত। তবে আপনি কেন তাকে অস্বাভাবিক বলে হেয় করছেন?

এমনই বহু ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সামান্য ভিন্নতার কারণে আমরা অন্যরকম কাউকে অস্বাভাবিক বলে চালিয়ে দেবার প্রবণতা দেখতে পাই। সাদার সমাজে কালো অবাঞ্ছিত। কালোদের কাছে সাদা পূজ্য মানলেও দূরত্ব বজায় রাখবার প্রয়াস থাকে আমাদের। একজন বিষমকামীর কাছে একজন সমকামী হয়ে যান অসুস্থ কিংবা 'অস্বাভাবিক'! আবার একজন বৃহন্নলাকে দূর থেকে হাতে তালি দিয়ে টিটকারি দেন বিষমকামী কিংবা সমকামী দুজনেই।

অনেক ক্ষেত্রেই ধর্ম আর সমাজ-সংস্কৃতি মানুষকে ভিন্ন কিছু আপন করার পথে অন্তরায় হয়। আমাদের চারপাশ আমাদেরকে যা কিছু ভিন্ন, যা কিছু অদেখা তাকে অন্ধকার বলে চিনতে শেখায়। অন্যরকম মানেই অস্বাভাবিক ব্যাপারটার হাতেখড়ি সেখানেই!

কিন্তু অন্যরকম মানেই তো অসুন্দর নয়, অন্যরকম মানেই অশুচি কিংবা অস্পৃশ্য নয়। তবে বাধা কিসের? একজন মানুষের অস্তিত্বের বিচারটা কি তার বর্ণ, জাতি, যৌনতা দ্বারা করা বিবেচক নাকি তার গুণ, সততা, মনুষ্যত্ব বা অবদান দিয়ে করা উচিত? একটা সময় যুক্তরাষ্ট্রে সাদার সাথে কালোর মিলনকে অপ্রাকৃতিক বলা হত, ধর্মের দোহাই দেয়া হত। আজও যদি সেই অন্যরকম কোনো কিছুকে অস্বাভাবিক বলে ধরে নেয়া হয় তবে তো রিহানার মতো সঙ্গীতশিল্পীরা হয়তো সাদার দেশে গান না গেয়ে রাতের খাবার পরিবেশন করতেন।

সাদা কালোর বিভেদে এগিয়েছে পৃথিবী। এগিয়েছে নারীর স্বাধীন বিচরণকে স্বাভাবিক ধরে নেয়ার ক্ষেত্রে। এগিয়েছে আরও অনেক ক্ষেত্রে। এগোবার আরো অনেক বাকি আছে। সমলিঙ্গের কাউকে ভালোবাসার কারণে সমাজ আপনাকে অস্বাভাবিক ভাবতে পারে, নিজের কাছেও হতে পারেন ঘৃণ্য। তবে নিজেকে অক্ষম না ভেবে অসাধারন গুনের অধিকারী করে গড়ে তুলতে সময় ব্যয় করুন। সমাজ আপনাকে অস্পৃশ্য ভাবতে পারে, কিন্তু স্বীয় অসীম যোগ্যতায় দেখিয়ে দিন, আপনি অন্যরকম হতে পারেন, কিন্তু কিছুতেই অস্বাভাবিক নন। ■

Scanned with MOBILE SCANNER

রূপবান সংবাদ

প্রণয়নামা

বিগত ১০ ডিসেম্বর ইএমকে(EMK) সেন্টারে হয়ে গেল ভালোবাসার গল্প শোনাবার জমজমাট আসর প্রণয়নামাঃ আমাদের ভালোবাসার গল্প। মূলত ১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস-কে উদযাপনের জন্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে ভালোবাসতে গিয়ে যেসমস্ত প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় কিংবা ভালোবাসায় যেসব অন্তরায় আছে সেসমস্ত নানা বিষয় প্রাসঙ্গিক কবিতা, গল্প-পাঠ, নাটক, আলোচনা, নৃত্য ইত্যাদির মাধ্যমে সবার সামনে তুলে ধরা হয়। প্রত্যেক বছরই মানবাধিকার দিবস উদযাপন করতে 'বয়েজ অব বাংলাদেশ (bob)'-এর তরফ থেকে নানা রকমের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছর প্রণয়নামা-এর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সকল রকমের প্রেমের কথা উঠে এলেও দুজন পুরুষ বা দুজন নারীর মধ্যকার প্রেমের প্রসঙ্গ পুরো অনুষ্ঠান জুড়েই ছিল বলিষ্ঠভাবে। সন্ধ্যা সাতটায় বিশেষ অতিথি লুবনা মরিয়াম অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

ওয়ার্কশপ

গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে বার্লিন ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান 'ইন্সটিটিউট অব কুয়ের থিওরি' বাংলাদেশের 'জার্মান কালচারাল সেন্টারের'র সাথে দুই দিন ব্যাপী এক কর্মশালার আয়োজন করে। এটি মূলত একটি গবেষণাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান যেখানে 'এ্যাডভান্স সেক্সুয়াল স্টাডি' এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিনিময় কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। কর্মশালার প্রথম দিনে 'এলজিবিটি কমিউনিটি' সদস্যদের সাথে তারা সাক্ষাৎ এবং মতবিনিময় করেন। দ্বিতীয় দিনে সকল স্তরের ছাত্র, মিডিয়া কর্মী এবং সাংবাদিকদের জন্য কর্মশালাটি উন্মুক্ত ছিল।

আইডাহো কনসার্ট

গত বছরের ১৭ই মে 'বয়েজ অব বাংলাদেশ (bob)'-এর পক্ষ থেকে 'ইন্টারন্যাশনাল ডে এগেইন্সট হোমোফোবিয়া' পালন করা হলো গান আর কনসার্টের মধ্য দিয়ে। ১৯৯০ সালের এই দিনে 'হোমোসেক্সুয়ালিটি'কে ডব্লিওএইচও রোগের তালিকা থেকে বাদ দেয় এবং সেখান থেকেই দিনটিকে আলাদা করে উদযাপন করা হয়। কনসার্টের উদ্যোক্তা সাখাওয়াত হোসেন আমাদেরকে জানান যে, সঙ্গীত হচ্ছে এমন একটা উপাদান যা মানুষকে পরস্পরের কাছে নিয়ে আসে। সঙ্গীতের সেই সার্বজনীন আবেদনকে কাজে লাগিয়ে সবার মধ্যে সম্প্রীতি এই অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ছিল। আনুশেহ আনাদিল, নির্বর চৌধুরী আর সেথ পান্ড অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন। বনানীর কজমো লাউঞ্জে হয়ে যাওয়া এই অনুষ্ঠানে প্রায় দেড়শো'র মতো অতিথি ছিলেন। ভবিষ্যতে 'বয়েজ অব বাংলাদেশ' আরো বড় করে এই আয়োজন করতে চায় বলেও জানিয়েছে। ■

ইউপিআর-এ বাংলাদেশ: প্রসঙ্গ সমকামিতা

বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৭০টি দেশে এখন সমকামিতা একটি ক্রিমিনাল অফেন্স। প্রতিটি দেশেই কমবেশি আন্দোলন হচ্ছে এর বিরুদ্ধে।

"সমকামিতা কি আদৌ কখনও স্বীকৃতি পাবে বাংলাদেশে? যেখানে সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র, আইন, সবকিছুই এর পরিপন্থী সেখানে এ ধরনের পরিবর্তন আশা করাটা কি বোকামি নয়? আর শুধু আইন বদল করেই কি কাজ হবে? সমাজকে সবার আগে বদলাতে হবে! আইন তো আছে ভুরিভুরি কিন্তু কজন মানুষ তা মানে?"

"৩৭৭ ধারা বাদ দিলেই কি সমকামীদের অধিকার রক্ষা হয়ে গেলো? পরিবার মেনে নিবে? সমাজে গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে?"

"৩৭৭ একটি নিষ্ক্রিয় আইন। এটা নিয়ে কাজ করা মানে হচ্ছে ঘুমন্ত সিংহকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তোলা। আমাদের দেশের অনেকেই এখনও জানে না ৩৭৭ ধারা কি! তাই 'বয়েজ অব বাংলাদেশ (bob)'র এটা নিয়ে লাফালাফি নেতিবাচক ফল ছাড়া অন্য কোনো প্রভাব ফেলবে না। এটা যেভাবে আছে সেভাবেই রেখে দেওয়া উচিত।"

"৩৭৭ ধারা মাথার উপর খড়্গের মতো। এটা থাকা মানেই হচ্ছে সমকামীদের ক্রিমিনাল বানিয়ে রাখা। আজ হয়তো সেভাবে ব্যবহার হচ্ছে না কিন্তু হতেই বা কতক্ষণ? আমরা কি সেইদিনের জন্য অপেক্ষা করবো যেদিন এই আইন তীব্র কদাকার রূপ ধারণ করবে? নাকি এখন থেকে আস্তে আস্তে চেষ্টা করবো এটাকে বাতিল করার জন্য!"
যখনই ৩৭৭ ধারা বিলুপ্তি নিয়ে কথা উঠে, তখনই এর প্রয়োজনীয়তা, সুফল, কুফল, কৌশল এবং প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়। একদল পক্ষে তো আরেক দল বিপক্ষে। সত্যি কথা বলতে, এই সমস্ত মতামত এবং আলোচনা-পর্যালোচনার কোনো বিকল্প নেই। সকল স্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করার মূল বিন্দুটি হতে পারে এসব আলোচনা। আমরা চাই সমাজ আরো বেশি বেশি করে প্রশ্ন তুলুক এবং আলোচনার পথ বিস্তৃত করুক। কিন্তু কেবল আলোচনাতেই সকল সমাধান আসবে, এমনটা আমরা বিশ্বাস করি না। তর্কের সাথে সাথে কর্ম চালিয়ে যাওয়াতে BOB বিশ্বাসী। শুরু থেকেই ৩৭৭ ধারার বিরুদ্ধে অবস্থান আমাদের 'এজেন্ডা'য় ছিল এবং দিন দিন তার বিস্তার ঘটছে।

আমরা যখন, যেখানে, যেভাবে সুযোগ পেয়েছি, ৩৭৭ ধারার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি। 'অনলাইন ডিসকাশন', কমিউনিটি আড্ডা, পত্রপত্রিকা থেকে শুরু করে সুদূর জাতিসংঘ পর্যন্ত চেষ্টা করেছি ৩৭৭ নিয়ে আমাদের উদ্বেগের কথা পৌঁছে দিতে। এর অংশ হিসেবে কিছুদিন আগেই ঘটে যাওয়া 'ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ (UPR)' এ BOB-এর অংশগ্রহণ সম্পর্কে আপনাদের জানাতেই এই লেখার সূত্রপাত।

সার্বজনীন পর্যালোচনা পদ্ধতি বা 'ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ (UPR)' হচ্ছে জাতিসংঘ মানবাধিকার ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত একটি নতুন পদ্ধতি। এই পদ্ধতির আওতায় জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল প্রতি সাড়ে চার বছর পর পর জাতিসংঘের প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে। এই পদ্ধতি শুরু হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ এই পর্যন্ত দুইবার পর্যালোচিত হয়েছে; ২০০৯ এবং ২০১৩ সালে। ইউপিআর-এর ক্ষেত্রে একটি দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর তিনটি প্রতিবেদন বিবেচনায় নেওয়া হয়। একটি হচ্ছে রাষ্ট্র কর্তৃক তৈরি, দ্বিতীয়টি জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশন (OHCHR)-এর কার্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন আর তৃতীয়টি হচ্ছে বিভিন্ন এনজিওদের পাঠানো প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।
২০০৯ সালে সময় স্বল্পতার জন্য আমরা প্রথম থেকেই ইউপিআর-এর সাথে সংযুক্ত হতে পারিনি। তবে 'সেক্সুয়াল রাইটস ইনিশিয়েটিভ (SRI)' কর্তৃক প্রকাশিত এবং আদনান হোসেনে'র লেখা 'বাংলাদেশের এলজিবিটি কমিউনিটি রিপোর্ট' এ আমরা 'ইনপুট' দেই। তার প্রেক্ষিতে সেই বছর জাতিসংঘের দুইটি রাষ্ট্র বাংলাদেশ সরকারকে ৩৭৭ ধারা বিলোপ করার জন্য বলেছিল। সেবার বাংলাদেশ সরকার রীতিমতো তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। প্রত্যাখ্যান করার কারণ হিসেবে বলেছিল বাংলাদেশ একটি ঐতিহ্যগত মুসলমান প্রধান রাষ্ট্র এবং এখানে এ ধরনের কোনো 'কমিউনিটি' নেই।

PDF Scanned with MOBILE SCANNER

চার বছর পর ২০১৩ সালে আবার যখন ইউপিআর -এর সময় আসে, BOB প্রথম থেকেই আট-ঘাট বেধে নামে যেন এইবার সুযোগটাকে ভালোভাবে কাজে লাগানো যায়। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল সরকারের গতবারের দাবি 'বাংলাদেশে কোনো এলজিবিটি কমিউনিটি নেই' তা চ্যালেঞ্জ করা। এটা ছিল আমাদের অস্তিত্ব জানান দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা মাত্র। যেখানে সরকার বছরের পর বছর কোটি কোটি টাকা বিদেশ থেকে নিয়ে আসছে 'এমএসএম' এবং 'এইচআইভি/এইডস'-এর কাজের জন্য। যেখানে শিক্ষা, পরিবার, সমাজ, সব জায়গাতেই সমকামীরা নিগৃহীত হচ্ছে। সেখানে তো সরকার বলতে পারে না দেশে সমকামী জনগোষ্ঠী নেই।

এবার আমরা সব মিলিয়ে তিনটি রিপোর্ট পাঠিয়েছিলাম জাতিসংঘে- 'হিউম্যান রাইট ফোরাম অব বাংলাদেশ (HRFB)' 'গ্লোবাল হিউম্যান রাইটস ডিফেন্স (GHRD)' এবং 'সেক্সুয়াল রাইটস ইনিশিয়েটিভ (SRI)'-এর সাথে এক হয়ে কাজ করার মাধ্যমে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে HRFB-এর রিপোর্ট। HRFB হচ্ছে দেশের প্রধান প্রধান সতেরোটি মানবাধিকার সংস্থার সমন্বয়ে তৈরি এক নেটওয়ার্ক। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ব্লাস্ট, নিজেরা করি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, নারীপক্ষ, বন্ধু সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইত্যাদি। BOB এদের সবার সাথে কাজ করতে পেরে গর্বিত এবং সম্মানিত।

বাংলাদেশের রিভিউ হয় গত বছরের এপ্রিলে। ঐ তিনটি রিপোর্টের প্রেক্ষিতে এবারও বেশ কিছু রাষ্ট্র এলজিবিটি পরিস্থিতি নিয়ে তাদের সুপারিশ পেশ করে। এর মধ্যে চিলি সরাসরিই বলেছে ৩৭৭ ধারা বিলোপ করতে। ইউএসএ বলেছে, এলজিবিটি জনগোষ্ঠীর উপর বৈষম্য এবং নিপীড়ন বন্ধ করতে। ইউকে জিজ্ঞেস করেছে, ৩৭৭ ধারা বিলোপ করার চিন্তা ভাবনা সরকারের আছে কিনা। গতবারের মতোই এবারও সরকার এই সুপারিশগুলো প্রত্যাখ্যান করেছে কিন্তু এবার আর বলেনি যে দেশে এলজিবিটি কমিউনিটি নেই। বরং এবার সরকারের অবস্থান অনেকখানি ইতিবাচক। সরকার বলেছে,

"On LGBT, we concur with NHRC on law of land. However we recognize the need for protecting more vulnerable groups of our population given their constitutional rights and freedom. Moreover, we don not condone any discrimination or violence against any human being on any pretext."

গতবারের মতোই এবারও সরকার এই সুপারিশগুলো প্রত্যাখ্যান করেছে কিন্তু এবার আর বলেনি যে দেশে এলজিবিটি কমিউনিটি নেই।

তাই একভাবে সরকার এবার আমাদের অস্তিত্ব স্বীকার করেই নিয়েছে এই বিবৃতির মাধ্যমে। এটা ছিল এবারের UPR থেকে আমাদের সবচেয়ে বড় পাওয়া।

এবারের ইউপিআর থেকে আমরা আরো অনেক কিছুই পেয়েছি। BOB এখন দেশের সবচেয়ে বড় মানবাধিকার নেটওয়ার্ক HRFB এর সদস্য। এর অর্থ হচ্ছে HRFB- এর অন্তর্ভুক্ত সতেরোটি সংগঠন এবং তাদের অসংখ্য আঞ্চলিক অফিস এখন আমাদের নেটওয়ার্কের আওতায় এবং তারা আমাদের ইস্যুটাকে গুরুত্বসহকারে নিয়েছে। দেশের মানবাধিকার আন্দোলনের সর্বাগ্রে থাকা এসব সংগঠনের সমর্থন পাওয়া বিশাল ব্যাপার। যখন সুলতানা কামাল বা খুশি কবির কিংবা ড. ইফতেখারুজ্জামান দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেন 'এলজিবিটি অধিকার বৃহৎ মানবাধিকার আন্দোলনের একটি অংশ', তখন এর তাৎপর্য বেড়ে যায় বহুগুণ। এটা আমাদের বিশাল অর্জন যে দেশের মানবাধিকার সংস্থাগুলি আমাদের সাথে আছে।

ইউপিআর-এর জন্য আমাদের দৌড়-ঝাঁপও করতে হয়েছে বিস্তর। বিভিন্ন এনজিও থেকে শুরু করে বিভিন্ন হাইকমিশন, দাতা সংস্থা, ব্যক্তি এমন অনেকের কাছেই আমরা আমাদের ইস্যু পৌঁছে দিতে পেরেছি। পাশাপাশি মিডিয়াতেও কভারেজ এসেছে অনেক। অবশ্যই এর ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দুটো দিকই আছে কিন্তু 'সাপও মারবো লাঠিও ভাঙবে না' তা কি করে হয়! আন্দোলনের আসলে কোনো সঠিক, সংঘাতবিহীন এবং আশু সমাধান নেই। আমরা জানি ৩৭৭ ধারা এতো সহজে যাবার নয়। পাশের দেশে ইন্ডিয়াতে এখনো জোরালো আন্দোলন চলছে, শ্রীলংকাতে কিছুদিন আগ পর্যন্ত কেবল পুরুষ সমকামিতা নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু আন্দোলনের ফলে ঐ আইনে এখন নারী সমকামীদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৭০টি দেশে সমকামিতা এখনো 'ক্রিমিনাল অফেন্স'। প্রতিটি দেশেই কমবেশি আন্দোলন হচ্ছে এর বিরুদ্ধে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এই আন্দোলনের সবচেয়ে বড় সমর্থক এখন জাতিসংঘ। শঙ্কা তো আছেই কিন্তু পাশাপাশি এই প্রেরণাও আছে যে আমরা আমাদের ইস্যুটাকে সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যেতে পেরেছি। পরিণাম কি হবে, জানি না কিন্তু, শুরু তো হয়েছে! ■

Scanned with MOBILE SCANNER

আমার ছেলেবেলা

প্রচণ্ড শব্দ করে কিছুতে বাড়ি পড়ছে, অনবরত পড়েই যাচ্ছে। তালের পর তাল মিলিয়ে, ধপ্ ধপ্ ধপ্! আমার শরীরের প্রত্যেকটা লোমকূপের গোড়ায় গোড়ায় শব্দটা এসে যেন বাড়ি মারছে, টের পাচ্ছি শরীরটা তীর তীর করে কেঁপেই যাচ্ছে, আমার প্রত্যেকটা অঙ্গে অঙ্গে সাড়া পড়ে গেছে ততোক্ষণে। আমার বয়েস তখন ষোল, সিলেটের জিন্দাবাজারের পাশেই একটা দোতলা পুরানো ধাঁচের বাড়িতে বাবা মা'কে নিয়ে থাকি। ফাইনাল শেষ তাই লেপের নীচে আলসেমি পাকিয়ে শুয়ে আছি ঘুম ভেঙ্গে যাবার পরেও। ঠিক এমন সময়টায় এই বাড়ি মারার শব্দ আমার সব আলসেমি এক ফুঁ'তে উড়িয়ে দিল যেন, আমার কপালে ফোটা ফোটা ঘাম জমছে কিন্তু শব্দটা কিছুতেই থামছে না। আমার শোবার ঘরটার পাশেই বেশ বড় সাইজের একটা কার্পেট রাখা ছিল লাল রঙের, ধূলো ঝাড়ার জন্য বারান্দায় লম্বা করে টানিয়ে বড় একটা লাঠি দিয়ে গম্ গম্ শব্দে সেটার গায়ে বাড়ি মারছে সুমন ভাই। জিন্দাবাজারে

আমাদের যে সবজির আড়ত, সেখানে কাজ করতো সুমন ভাই, বিশ বাইশের মতো বয়েস হলেও তার নির্মেদ শরীরে পেশীর টান দেখতে সেই ছোটবেলা থেকেই আমার ভালো লাগতো। সেই বাড়ির শব্দ থামছে না, সুমন ভাই কোনোদিন জানতে পারেনি যে ঐদিন সকালে তার প্রত্যেকটা বাড়ির শব্দের সাথে সাথে আমার শরীরটা কি তালে নেচেছিল। লেপের তলায় এক অদ্ভুত যন্ত্রণা আর আরামের মিশেলে আমার পুরো শরীরটা শক্ত হয়ে উঠছিল। আমার শরীরের এই অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া নিয়ে ততোদিনে আমি অনেকটাই অভ্যস্ত, আরো ছোটবেলা থেকেই আমি টের পেতাম যেকোনো কিছুতে বাড়ি লাগার শব্দে আমার শরীরে প্রতিক্রিয়া হয়। খুব ছোটবেলায় বাবার সাথে বসে যখন তোষক বানাতে দেখতাম, প্রত্যেকটা বাড়ির শব্দে আমার গায়ের লোমগুলো দাঁড়িয়ে যেত। বয়েস অনেক কম থাকায় তখন কিছুতেই এই ব্যাপারগুলির সাথে আমার কোনো যৌন সম্পৃক্তি ছিল না। যতো বয়েস বেড়েছে, টের পেয়েছি এই শব্দগুলি আমাকে উত্তেজিত করে, বাসায় পেরেক পোতার শব্দ থেকে শুরু করে কাপড় কাচা, সব আঘাতের শব্দেই আমার দেহ অল্প-বিস্তর সাড়া দিত। আর সেই শব্দগুলোর সাথে সুমন ভাইয়ের মতো কেউ জড়িত থাকলে সেদিন ভোরের মতোই আমাকে লেপের তলায় ঘামিয়ে তুলতো। আমি জানতাম আমার শরীর কষ্ট পেতে ভালোবাসে। আমি খুব ভালো ছাত্র ছিলাম, শান্ত ছেলেও ছিলাম। একদিন স্কুলে হোমওয়ার্ক নিতে ভুলে যাবার পর কবজিতে চিকন দুই নাম্বারী বেতের বাড়ি খেয়েছিলাম। খুব জ্বলছিল তখন। বাসায় এসে জামা খুলে সেই লাল দাগটার দিকে তাকাতেই মাথাটা কেমন চক্কর দিল। দরজা বন্ধ করে লাল সেই দাগটাকে আঙুল দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সেদিন পুরো বিকেলটায় আমি যে তীব্র সুখ পেয়েছিলাম, হয়তো তার লোভেই এরপর আরো অনেকদিন স্কুলে জেনেশুনে হোমওয়ার্কের খাতাটা নিয়ে যাইনি।

ইউনিভার্সিটির প্রথম বর্ষে উঠেছি যখন, ততোদিনে আমি জানি যে মেয়েদের বদলে ছেলেদের দিকেই আমার শারিরীক আকর্ষণ বেশি কাজ করে। এসব আকর্ষণের জোরেই হয়তো অনলাইনের অমিতের সাথে অফলাইনে প্রথম দেখা হয় আমার। খাটো করে ছেলেটার তীক্ষ্ণ খোঁচা খোঁচা দাড়িগুলো দেখে আমার প্রথম দিনেই ওকে দেখে ভালো লেগে যায়, তেজকুনি পাড়াতে একটা ছোট্ট মেসে ভাড়া থাকতো এমবিএ করা অমিত। একদিন ওর সাথে করেই তেজকুনি পাড়ার সেই এক রুমের মেসটায় গেলাম, ঘরের মধ্যেই দড়িতে লুঙ্গি, আন্ডারওয়্যার সব ঝুলছে। ওর সাথের ছেলেটা ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছে তাই রুমটা ফাঁকা। সেটা বোধ হয় আমার জীবনের সবচেয়ে অদ্ভুত দিনগুলির একটি। কথা বলতে বলতে ছেলেটা কখন যে গায়ের উপর চেপে বসলো, অনেকটা খেই হারিয়ে দিশেহারা আমি। ছেলেটা আমাকে চুমু দিতে চাচ্ছিল কিন্তু আমি নিচ্ছিলাম না, আমি ওকে বললাম, আমার ঠোঁট কামড়ে ধরতে। অমিত কিছুটা অপ্রস্তুত কিন্তু যা বললাম তাই করলো। এরপর পুরো শরীর জুড়েই ওকে কামড়াতে বলেছিলাম। শুরুতে ওর কেমন লেগেছিল জানি না, কিন্তু এই ব্যাপারটা এক সময় নাকি ওর নেশার মতো হয়ে গিয়েছিল এবং পরে গিয়ে ওর সাথে যে মেয়েটার বিয়ে হয়, তাকেও অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। বড় অদ্ভুত ছিল সেই দিনটা, অমিতের শরীর আমার মধ্যে ঢুকে যাবার পর কিছুক্ষণ আটকে রেখছিলাম ওকে, সেই ছন্নছাড়া তীব্র ব্যথায় যে সুখ, সেই সুখের রেশ আমি এখনো টের পাই। একবার ওর সেই মেসেই গামছা দিয়ে আমার দুই হাত বেঁধে ফেলেছিল অমিত, আমি কি চাই ততোদিনে ছেলেটা সব বুঝে নিয়েছে। আমি গোঙ্গানির মতো করে একটা শব্দ করতাম, সেই শব্দটা শুনে অমিত একেক সময় হন্যে হয়ে যেত।

সিগারেট খেতো অমিত, একদিন ওকে বলেছিলাম সেই সিগারেটের হাল্কা করে আমার হাতে চেপে ধরতে, অমিত রাজি হয়নি। আমি ততোদিনে জানি ছেলেটা আমার প্রতি দুর্বল। আর আমি? ভালবাসতাম! ও কোনদিন বোঝেনি সেভাবে, কিন্তু আমি জানতাম এই খাটো করে খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভরা ছেলেটাকে আমি কতটা ভালোবাসি। আর সেই ভালোবাসাই আমার কাল হয়েছিল। আমি ওর সাথে সম্পর্ক করে ভালোবেসে একসাথে থাকতে চাইনি, আমি চেয়েছিলাম ওর আমার থেকে দূরে চলে যাওয়াটা আমাকে যন্ত্রণা দিক, এই যন্ত্রণার মধ্যে সুখ খুঁজে পাওয়াটাই আমার জীবন হয়তো।

জীবনে এর পরেও আরো অনেকবার ভালো কিছু পেয়েও ইচ্ছা করে যে হারিয়েছি, সেটা আমার হেয়ালি ছিল না কোনোদিন, সেটা হয়তো আমার দূর্বলতা। ক্র্যাফট এবিং-এর 'ম্যাসোকিজম' কিংবা 'সেলফ ডিফিটিং পার্সোনালিটি ডিসোর্ডার' নিয়ে জেনেছিলাম আরো অনেক পরে। তবে আমি অসুখী নই। সুখের চিরায়ত সংজ্ঞা আমার কাছে অন্যদের চেয়ে একটু ভিন্নরকমভাবেই হয়তো ধরা দিয়েছে। 'সুখের লাগিয়া' বাঁধা ঘরের চাইতে 'অনলে পুড়িয়া' যাওয়া ঘরেই আমার উল্লাসের আসল মুক্তি।

Scanned with MOBILE SCANNER

মানসিক ব্যাধি

রিচার্ড ভন ক্রাফট এবিং ১৮৮৬ সালে জার্মানীতে বসে ২৩৮ রকমের ভিন্ন ভিন্ন যৌন ব্যবহারের বর্ণনা দিয়ে 'সাইকোপ্যাথিয়া সেক্সুয়ালিস' বইটি বাজারে ছাড়লেন যেদিন, সমকামিতাকে মানসিক বিকৃতি হিসেবে মনোবৈজ্ঞানিক তকমা লাগানোর উদ্বোধন হলো যেন সেদিন। তারপর থেকে প্রায় একশ বছর ধরে সকল 'ডিগ্রীধারী' মনোবিজ্ঞানী আর ডাক্তারেরা যৌনতার এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে 'অস্বাভাবিক' হিসেবে চিত্রিত করে গেছেন। শুধু তাই নয়, তারা সমকামীদের 'রোগমুক্ত' করতে পুরো উনিশ শতক জুড়ে নানাধরনের নিষ্ঠুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, অত্যাচার করেছেন, নির্যাতন করেছেন, এবং শেষ পর্যন্ত একটা সময় মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন যে সমকামিতা আসলে কোনো রোগ নয়। আসলে স্পষ্ট করে বললে বলতে হয় সারা দুনিয়া জুড়ে সমকামী মানবাধিকার কর্মীরাই ডাক্তার এবং মনোবিজ্ঞানীদের মনে গেঁথে যাওয়া 'বৈজ্ঞানিক কুসংস্কার' ভেঙ্গেছেন, তারা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন সমকামী হয়েও স্বাস্থ্যকর এবং সুখী জীবনযাপন করা যায়। তারপরেও সমকামিতাকে এখনো অনেকেই ভুলভাবে এক ধরনের 'রোগ' বলে মনে করে থাকেন। তারা ভাবেন চিকিৎসার মাধ্যমে এই ধরনের রোগ আসলেই ভালো করে ফেলা সম্ভব। সত্যিই কি তাই?

> সম্প্রতি সমকামিতা নিয়ে জনগনের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হবার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য 'অজ্ঞাতকূলশীল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের' দিয়ে কলাম লেখানো হচ্ছে, কখনো বা বিশেষজ্ঞের অভিমত দেয়ানো হচ্ছে। এই সমস্ত 'কলামিস্ট বিশেষজ্ঞরা' সমস্যা সমাধানের নামে এমন সমস্ত দাওয়াই বাৎলে দিচ্ছেন যে, তাতে শুধু তাদের জ্ঞানের দীনতাই ফুটে উঠছে না, সেই সাথে সামগ্রিক পরিস্থিতিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হতাশাব্যঞ্জক দিকে।

একটি ব্যাপার এক্ষেত্রে পরিস্কার করে বলা দরকার যে, সমকামিতা আসলে এক রকমের যৌন-প্রবৃত্তি আর যৌন-প্রবৃত্তি জিনিসটা কোনো রোগ নয়, যেটা চিকিৎসা করে 'নিরাময়' করা যেতে পারে। তারপরেও লাইসেন্সধারী ডাক্তাররা সমকামিতাকে একটা সময় 'রোগ' হিসেবে চিহ্নিত করে তা 'সারানোর' চেষ্টা করেছিলেন এবং সমকামিতা-চিকিৎসার যে সমস্ত দাওয়াই তারা বাৎলে দিয়েছিলেন তা কেবল 'পিশাচ কাহিনী' আর 'হরর মুভি'গুলোতেই দেখা যায়। তারা চিকিৎসার নামে কখনো রোগীদের ইলেক্ট্রিক শক দিতেন, কখনো মস্তিষ্কে সার্জারি করে একটা অংশকে অকেজো করে দিতেন, কখনো বা দেহে ইচ্ছেমতন হরমোন প্রবেশ করাতেন, এমনকি খোজা পর্যন্ত করে দিতেন। তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতিটি ছিলো 'অরুচি বা বমি চিকিৎসা (এভারেশন থেরাপি)'। এই চিকিৎসায় সমকামী পুরুষকে চেয়ারে বসিয়ে নানা ধরনের যৌনকামনা উদ্রেককারী সমকাম-নির্ভর ছবি দেখানো হত আবার সেই সাথে তার পুরুষাঙ্গে বৈদ্যুতিক শক্ প্রয়োগ করে বমি করানোর চেষ্টা করা হত। এ ধরনের বহু নৈরাজ্যজনক ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে সমকামিতার কৃষ্ণ ইতিহাস। সমাজের এই ধরনের ট্যাবু ভাঙতে ভাঙতেই প্রতিনিয়ত এগুতে হয়েছে সমকামীদের। শেষ পর্যন্ত ১৯৭৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর 'আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক এসোসিয়েশন' স্বীকার করে নেয় সে সমকামিতা কোনো রোগ নয়, এটি যৌনতার স্বাভাবিক

MOBILE SCANNER

প্রবৃত্তি। এই দিনটিকে বলা যায় সমকামিতার আইনী অধিকার এবং সামাজিক স্বীকৃতি আদায়ের লড়াইয়ে এক বিরাট মাইলফলক, এক ঐতিহাসিক বিজয়ের দিন। প্রসঙ্গতঃ 'আমেরিকান সাইকোলজিকাল এসোসিয়েশন' ১৯৯৪ সালে 'স্টেটমেন্ট অন হোমোসেক্সুয়ালিটি' শিরোনামে যে বিবৃতি জনসমক্ষে প্রকাশ করে, তার প্রথম দুটো অনুচ্ছেদ এখানে দেয়া হল:

"সমকামিতা নিয়ে গবেষণার ফলাফল খুবই পরিষ্কার। সমকামিতা কোনো মানসিক রোগ নয়, নয় কোনো নৈতিকতার অধঃপতন। মোটা দাগে এটি হচ্ছে আমাদের জনপুঞ্জের সংখ্যালঘু একটা অংশের মানবিক ভালোবাসা এবং যৌনতা প্রকাশের একটি স্বাভাবিক মাধ্যম। এমনকি সমকামিতা বিষয়টি কারো পছন্দ বা চয়েসের ব্যাপারও নয়। গবেষণা থেকে বেরিয়ে এসেছে যে, সমকামী প্রবৃত্তিটি জীবনের প্রাথমিক পর্যায়েই তৈরি হয়ে যায়, এবং সম্ভবত তৈরি হয় জন্মেরও আগে। জনসংখ্যার প্রায় দশভাগ অংশ সমকামী।"

মনোবিজ্ঞানীরা রণে ভঙ্গ দিলেও পরবর্তীকালে ঘোট পাকাতে আবারো এগিয়ে আসলেন আরেকদল বিজ্ঞানের তকমা লাগানো কেউকেটাদের দল আধুনিক জেনেটিক্স-ওয়ালারা। জিনগত গবেষণার ব্যাপারগুলো রঙ্গমঞ্চে আসার পর আবার নতুন করে সমকামিতাকে 'জেনেটিক ডিফেক্ট' হিসেবে দেখানোর চেষ্টা শুরু করেছিলেন কিছু কিছু 'বিশেষজ্ঞ'। কিন্তু সমকামিতার প্রবণতা যে কোনো জেনেটিক ডিফেক্ট নয় এটা অনেকভাবেই প্রমাণ করা যেতে পারে। কিভাবে সেটা? 'গে জিন' বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব বিজ্ঞানীরা (এখনো) বের করতে পারেননি। 'জিনগত' কোনো বিষয়

যদি থেকেও থাকে সেটা হয়ত বেশ কয়েকটি জিনের প্রভাবের সম্মিলিত ফল হবে। যদি আমরা তর্কের খাতিরে ধরেও নেই জিনের সাথে সমকামিতার সরাসরি একটা সম্পর্ক রয়েছেই, তারপরও এটাকে জনপুঞ্জের প্রকারণ বা 'ভ্যারিয়েশন' না বলে 'রোগ' বলাটা বালখিল্যই হবে। এগুলো কোনোটিকেই আমাদের সমাজে 'জেনেটিক রোগ' বলে চিহ্নিত করা হয় না।

জেনেটিক রোগের বিপরীতে সমকামিতার অবস্থানের আর একটি বড় কারণ হলো সংখ্যাধিক্য। খুব রক্ষণশীল হিসাবও যদি ধরা হয় সেটা কোনোভাবেই পৃথিবীর সামগ্রিক জনসংখ্যার শতকরা ৫ ভাগের কম হবে না। আর জেনেটিক ডিফেক্ট সে তুলনায় অনেকটাই দুর্লভ ঘটনা। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যাক। যদি কোনো জেনেটিক বৈশিষ্ট্য

ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়, তবে সেটি এক মিলিয়নে একটি ঘটতে দেখা যায়।

সমকামিতার ব্যাপারটি নিয়ে জল ঘোলা করা হয়েছে বিস্তর। নানা স্তর পার হয়ে শেষ পর্যন্ত 'আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক এসোসিয়েশন' ১৯৭৩ সালে যখন স্বীকার করে নিল যে, সমকামিতা কোনো রোগ নয়। হলো এক নতুন যুগের সূচনা। কিন্তু তারপরেও যে সবাই এটি মেনে নিয়েছেন তা নয়। ধর্মীয় মদদপুষ্ট কিছু চিকিৎসকদের সংগঠন আর কিছু ধর্মীয় সংগঠন বিচ্ছিন্নভাবে এখনো চিকিৎসার মাধ্যমে সমকামীদের 'রোগমুক্ত' করতে বদ্ধ পরিকর। তারা পুরুষদের আরো পুরুষালী আর মেয়েদের আরো মেয়েলী করে গড়ে তুলবার চেষ্টা করে আর পাশাপাশি অরুচি চিকিৎসার মতো অপচিকিৎসা চালাচ্ছে এখনো। পাশাপাশি আবার পরিচালনা করে ধর্মীয় প্রার্থনা সভার। এই চিকিৎসার নাম দিয়েছে 'রিপারেটিভ থেরাপি' (প্রচলিতভাবে অভিহিত করা হয় '[illegible]শন থেরাপি' হিসেবে)। তারা মনে করে

MOBILE SCANNER

“১৯৭৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক এসোসিয়েশন বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার মাধ্যমে একমত হন যে, সমকামিতা কোনো নোংরা ব্যাপার নয়, নয় কোনো মানসিক ব্যাধি। এ হলো যৌনতার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ১৯৭৫ সালে আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল এসোসিয়েশন একইরকম অধ্যাদেশ প্রদান করে। ‘ওয়ার্ল্ড হেলথ অরগানাইজেশন’ ১৯৮১ সালে সমকামিতাকে মানসিক রোগের তালিকা থেকে অব্যহতি দেয়। ‘আমেরিকান বার এসোসিয়েশন’ ১৯৭৪ সালে সমকামিতাকে সামাজিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। এর ফলে সমকামীরা পায় অপরাধবোধ থেকে মুক্তি। ১৯৯৪ সালে ‘আমেরিকান সাইকোলজিকাল এসোসিয়েশন’ তাদের ‘স্টেটমেন্ট অন হোমোসেক্সুয়ালিটি’ শিরোনামের একটি ঘোষণাপত্রে সমকামিতাকে একটি স্বাভাবিক যৌনপ্রবৃত্তি হিসেবে উল্লেখ করে এবং কারো যৌনপ্রবৃত্তিকে পরিবর্তন করার যেকোনো প্রচেষ্টাকে অনৈতিক বলে উল্লেখ করা হয়। ‘আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশন’ ১৯৯৪ সালের একটি রিপোর্টে অভিমত ব্যক্ত করে যে, সমকামীদের যৌনতার প্রবৃত্তি পরিবর্তনের চেষ্টা না করে বরং তারা যেন সমাজে ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারে আমাদের সেই চেষ্টা করা উচিৎ। ‘একাডেমী অব পেডিয়াট্রিক্স’ এবং ‘কাউন্সিল অব চাইল্ড এণ্ড এডোলেসেন্ট হেলথ’ স্পষ্ট করেই বলে যে সমকামিতা কোনো পছন্দের ব্যাপার নয়, এবং এই প্রবৃত্তিকে পরিবর্তন করা যায় না। ১৯৯৮ সালে ম্যানহাটন কনফারেন্সে ‘সাইকোএনালিটিক এসোসিয়েশন’ তাদের পূর্ববর্তী ‘হোমোফোবিক’ ব্যবহারের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে।”

এ ধরনের চিকিৎসা করে তারা সমকামী প্রবৃত্তি থেকে মানুষকে মুক্ত করতে পারছে। কিন্তু বাস্তবতা উল্টো। গবেষক এরিয়েল শিডলো এবং মাইকেল শ্রোডার ২০০২ সালের একটি গবেষণাপত্রে দেখিয়েছেন, শতকরা মাত্র ৩ ভাগ ক্ষেত্রে ‘রিপারেটিভ থেরাপি’র মাধ্যমে যৌনপ্রবৃত্তি বদল করা সম্ভব হয়েছে, শতকরা ৮৮ ভাগ ক্ষেত্রে এটি পুরোপুরি ব্যর্থ, এবং বাকিরা কোনো অভিমত দেননি। ক্লিনিক্যাল মনোবিজ্ঞানী ডগলাস হাল্ডম্যান এ ধরনের চিকিৎসাকে ‘সুডো সায়েন্স’ বলে অভিমত দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, মূলধারার কোনো চিকিৎসকেরাই এই ‘রিপারেটিভ থেরাপি’কে এখনো অনুমোদন করে না। অনেক সময় আবার সর্ষের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে ভূত। আশির দশকে আমেরিকায় একজন ‘এক্স-গে মিনিস্ট্রি’র পরিচালনায় একটি সংগঠন তৈরি করা হয় ‘হোমোসেক্সুয়াল এনোনিমাস’ নামে। সংগঠনের উদ্দেশ্য সমকামিতার হাত থেকে জনগণকে মুক্তি দেয়া। কিন্তু সেই সংগঠনের দুজন সদস্য মিডিয়ায় অভিযোগ করেন যে, তাদের যৌনপ্রবৃত্তির পরিবর্তন তো হয়ইনি বরং সংগঠনের পরিচালক তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। ‘এক্স-গে লিবারেশন ইন জেসাস ক্রাইস্ট’ নামে আরেকটি সংগঠনের পরিচালকের বিরুদ্ধেও সেখানকার সদস্যদের উপর যৌন আগ্রাসনের অভিযোগ উঠে এবং তাকে পরিচালকের পদ থেকে অব্যহতি দেয়া হয়। আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে অবস্থা আরো ‘কেরোসিন’। সম্প্রতি সমকামিতা নিয়ে জনগণের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হবার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য ‘অজ্ঞাতকুলশীল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের’ দিয়ে কলাম লেখানো হচ্ছে, কখনো বা বিশেষজ্ঞের অভিমত দেয়ানো হচ্ছে। এই সমস্ত ‘কলামিস্ট বিশেষজ্ঞরা’ সমস্যা সমাধানের নামে এমন সমস্ত দাওয়াই বাৎলে দিচ্ছেন যে, তাতে শুধু তাদের জ্ঞানের দীনতাই ফুটে উঠছে না, সেই সাথে সামগ্রিক পরিস্থিতিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হতাশাব্যঞ্জক দিকে।

বাংলাদেশের অনেক পত্রিকাতেই আবার একই কায়দায় উপদেশ দিয়ে ইসলামী মূল্যবোধ অনুসরণ করতে পরামর্শ দেয়া হয়, বলা হয় এতে সমকামিতার মতো বিকৃতি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। এর বাইরেও বহু ‘বিশেষজ্ঞের’ অবিশেষজ্ঞীয় মতামত আছে। ২০০৩ সালের এপ্রিল মাসে সিডনী স্টার পত্রিকায় প্রকাশিত ‘Why Gay Men Flee Bangladesh’ নামের প্রবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. শফিউল আজমের বরাত দিয়ে বলা হয়, বাংলাদেশে প্রতিবছর শতকরা ৩.৫ ভাগ হারে সমকামিতা প্রকোপ বাড়ছে, আর এর পেছনে দায়ী করা হয় ‘আর্সেনিক কন্টামিনেশন’কে। আরেকজন ‘বিশেষজ্ঞ’ সমকামিতার পেছনে দায়ী করেন হিন্দি ছবির প্রসারকে। বলা বাহুল্য পৃথিবীর আর কোনো গবেষণাতেই আর্সেনিক কিংবা হিন্দি ছবিকে সমকামিতার পেছনে কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি।

সমকামিতা কোনো রোগ নয়, বরং এটিকে রোগ হিসেবে চিহ্নিত করে একে সারাবার চেষ্টার ‘অভিপ্রায়’টিকেই বরং রোগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় আজ। গবেষক এরিক মার্কোস তার ‘ইস ইট এ চয়েস’ বইয়ে যে মন্তব্য করেছেন তার সাথে হয়তো অনেকেই আজ একমত পোষণ করবেন,

“যে সমস্ত থেরাপিস্টরা সমকামীদের যৌনপ্রবৃত্তি পরিবর্তন করতে চান, তাদের ধরে জেলে ভরা উচিৎ। মনোবিজ্ঞানীদের যেটা করা উচিৎ তা হলো রোগী যে প্রবৃত্তিরই হোক না কেন, তার অস্বস্তি দূর করে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে মনোবল বাড়িয়ে তোলা।” ■

Scanned with MOBILE SCANNER

ছোঁয়া

বেশ কিছুক্ষণ যাবত সেলফোনটার পর্দায় আঙ্গুল নাড়াচাড়া করে যাচ্ছি।

অনেক দামী টাচস্ক্রিন সেলফোন। আজকাল সেলফোনগুলোর ক্রিয়াকর্ম এতো জটিল থাকে! হোমস্ক্রিন থাকবে তিনটা। ঘষাঘষি করে অদলবদল করতে হবে। কোনটাতে দাঁত কেলানো আমার ছবি, কোনোটাতে মিষ্টি হাসি দেয়া প্রিয়তমার ছবি থাকবে। যখন যেটার মুড সেটায় বদলে নেয়া হবে।

আমি পরের হোমস্ক্রিনে যাওয়ার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি। কোনো অজানা কারণে সেলফোনটা আমার স্পর্শে সাড়া দিচ্ছে না। কিংবা আঙ্গুলগুলিই ধুলোবালি লেগে স্পর্শ অকেজো হয়ে গেছে!
আরেকবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিলাম। টেবিলের ওপ্রান্তে বসে থাকা নাসিম ভাইয়ের দিকে ঠেলে দিলাম ফোনটা।
'নিন ভাই, আপনার স্মার্টফোন আপনার কাছেই থাক। আমার আর স্মার্ট হয়ে কাজ নাই।'
নাসিম ভাই ভেংচি কেটে বললেন, 'আরে মিয়া স্মার্ট হও। নাইলে মাইয়াগো পাত্তা পাবা না। আর বিয়ে করলে তো বউ নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইবো।'

পাশের টেবিল থেকে বেলাল ভাই সায় জানালেন, 'হ! ঠিকই কইছেন। আজকাল মাইয়াগুলা যেই স্মার্ট। আর তুমি পোলা হইয়া স্মার্ট হইতে পারবা না?'
মৌনতা সম্মতির লক্ষণ। সম্মতি না জানালেও নীরব রইলাম। প্রত্যুত্তর দিয়ে নারী নিয়ে সস্তা কৌতুক উৎপাদনের রাস্তা করে পুরুষালী ভাব ধরা আপাতত স্পৃহণীয় নয়। আর হবেই বা কেন? নারী যে আমায় কামপীড়িত করে না। পুরুষ হয়েও পুরুষের প্রেমে উদ্বেলিত হই, নিষিদ্ধ কামনার পীড়ায় পীড়িত আমি। সে কামনা প্রকাশের জো আছে নাকি?

আমি তাই নিশ্চুপ কল্পনায় মাতি। স্বপ্নপুরুষের ছবি আঁকি। আমার স্বপ্নপুরুষ অবশ্য তেপান্তরের রাজপুত্তুর নয়, হলিউডি সিনেমার নায়কও নয়। দু কদম বাড়ালেই তার দেখা পাবো। খসখসে কাঁচঘেরা কক্ষে সে হয়তো কাগজপত্র স্বাক্ষরে মগ্ন কিংবা দ্রুতগতিতে লিখে যাচ্ছে কোনো রিপোর্ট। কাজপাগল লোক, আর ভীষণ খুঁতখুঁতে। প্রথম প্রথম বিরক্তই হতাম। প্রত্যেকটা কাজে খুঁত ধরা কি জ্বালাতন নয়? কাছাকাছি আসলেই তটস্থ থাকতাম, খানিকটা বিরক্ত থাকতাম। তখনো যে তার কায়া বা মায়া কোনোটাই নজরে পড়েনি। নজরে পড়ার মতো হয়তো ছিলও না, অন্তত সাধারণের নজরে।

সাধারণের স্বপ্নপুরুষ কেমন হয়? সুদর্শন নিশ্চয়! সুদর্শনের সংজ্ঞা কি? নায়ক ন্যায় মুখ? বাহুতে দৃঢ় পেশি? ছয়ভাগে বিভক্ত উদর? কিংবা মসৃণ ফর্সা ত্বক?
কোনোটাই তেমন কাম্য নয়। বরং তার বাহুর কালো লোমরাশি আমার নজরে পড়েছিল প্রথম। প্রেমের চিরাচরিত নিয়ম ভেঙ্গে চোখের মায়ায় না ভুলে ভুললাম লোমের মায়ায়! লোমরাজিতে ডুবসাঁতার কাটবে আমার আঙুলগুলো। সরসর করে সাঁতার কাটতে কাটতে আঙ্গুলগুলো পৌঁছে যাবে খসখসের হাতের তালুতে, দলিত মলিত হতে।

নাহ! চিন্তাগুলো অশ্লীলতার দোরগোড়ায় চলে যাচ্ছে। টেনে আনবো কি? ওই দোর পেরোলে কি হৃদয়ের সতীত্ব বজায় থাকবে? প্রেমের পবিত্রতা কি নষ্ট হবে না?

কিন্তু আমিই যে জানিনা কোনটা আমায় বেশি টানে, তার রাগান্বিত স্বরে কৈফিয়ত নেয়া নাকি বাঙালির স্বভাবনিয়মে মধ্যবয়সে পাক ধরা চুলের সমাহার। শারিরীক ক্ষুধায় আক্রান্ত হয়েছি নাকি প্রচলিত প্রেমের উপাখ্যান রচনা করতে চাই?

প্রচলিত প্রেম উপাখ্যান রচনা করিই বা কি করে? সেও তো রচিত হয় রাজপুত্র রাজকন্যার সমন্বয়ে। তাদের রূপে দেশব্যাপী জনতার মুগ্ধ হওয়া চাই! পুরুষ পুরুষ প্রেমের স্থান জগতে কই? আবার মেদহীন কার্শ্য কায়া নায়কদের হারিয়ে আমার স্বপ্নপুরুষকে নিয়ে মহাকাব্য জয় করিই বা কেমনে? তার ঈষৎ মেদে আমি মগ্ন হতে পারি, আমজনতার কাছে সে তো নাক সিটকানোর উপকরণের বেশি কিছু তো নয়!

সেকি! কাদের দুষছি আমি? নিয়মে বন্দি বিষমকামী সমাজকে? আমরাই বা কিসের 'সাম্যের গান গাহি!' নিয়মদোষে সমাজের চোখে রোগাক্রান্ত আমরা। তার মাঝে নিজের প্রায় দিগুণ বয়সী পুরুষের প্রেমে মগ্ন আমি যে গোদের ওপর বিষফোঁড়া! আমার রুচি নিজ জাতির কজনের কাছেই রুচিকর? কজনের কটূক্তি এড়িয়ে বলতে পারবো স্বপ্নপুরুষের কথা। আমার চাওয়া বুঝবেই বা কজনে!

স্মার্টফোনের মতো হবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করি। একটা হোমস্ক্রিনে যে মান থাকে না। সময় বুঝে নিজেকে বদলে নেয়া যায়। রঙ মাখিয়ে সং সাজিয়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে আর জুড়ি কিসের!

এতো কিছুর পরও তাকে আমি চাই। আমি পুরুষ চাই। দুবেলা শরীর চর্চা করা পুরুষে আমার আগ্রহ নয়, বরং ঈষৎ মেদের কোমলতায় হারাতে চাই। তার আলিঙ্গনে আমার আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত করতে চাই। দিনশেষে নিজের আকাঙ্ক্ষার দাস বই তো কিছু নই। বহুরূপী হয়ে পালানো যাবে সবার কাছ থেকে, নিজের কাছ থেকে তো নয়! তাই বোধকরি পুরনো বোতাম চাপা সেলফোনের মতোই 'ব্যাক বাটন' চেপে একই 'হোমস্ক্রিনে' ফিরে আসি বারংবার। [illegible] 'আনস্মার্ট' গোবেচারা! ■

Scanned with MOBILE SCANNER

ঢাকার পাঁচ!

সেই ব্রিটিশদের শাসনামল থেকে আজ অবধি, ঢাকা তার বুকে হরহামেশাই জায়গা করে দিচ্ছে নানারকম ভিন্নতাকে, আগলে রেখেছে বিভিন্ন বৈচিত্র্য। একজন পুরুষ হয়ে অন্য আরেক পুরুষকে সঙ্গী হিসেবে খুঁজে নেবার জায়গা করে দিতেও ঢাকা তাই কোনোদিন কার্পণ্য করেনি।

বাহাদুর শাহ পার্ক

ঢাকায় এখন চলছে ইন্টারনেটের সবচেয়ে কড়া সময়, ম্যাঞ্জাম কিংবা ফেসবুকের মতো ওয়েবসাইটগুলোর একচেটিয়া দাপটে কয়েক ক্লিকেই যে কেউ তৈরি করে নিতে পারে তার নিজস্ব ভার্চুয়াল এবং 'কাস্টোমাইজড' রমনা পার্ক, ওয়েব ক্যামটা একটু ঘোরালেই শরীরের অনেকটাই আয়ত্তে চলে আসে চারকোণা মনিটরের, কিন্তু তার আগের ঘটনাটা কি? ধরুন আশির দশক কিংবা তারও আগে? জবাব খুঁজতে পুরান ঢাকার সদরঘাট থেকে নেমে লক্ষীবাজারের দিকে সোজা হাঁটা ধরুন, একদম শেষ মাথাটায় গিয়ে সাত রাস্তার মিলনবিন্দুতে যে ডিম্বাকৃতি পার্কটির সন্ধান পাবেন, সেই বাহাদুর শাহ পার্কই ছিল ঢাকার অন্যতম প্রাচীন স্থান যেখানে রূপবানেরা তাদের নানারকম চাহিদা মেটাবার সন্ধানে সেই আশির দশক থেকে ভীড় জমাতে শুরু করে। বলা যেতে পারে ঢাকা তার বুকে রূপবানদের পরস্পরকে খুঁজে নেবার জন্য সবার প্রথম এই তীর্থভূমিই বরাদ্দ করে। সেই যুগের বাস্তবতায়, যেখানে নিজে পুরুষ হয়ে অন্য পুরুষের জন্য হন্যে হলে তাকে কি বলে, সেই নামটা পর্যন্ত কারো জানা ছিল না, এই বাহাদুর শাহ পার্ক তাদেরকে অভিনয়ের খোলস থেকে টেনে বের করে নিজের প্রকৃত প্রবৃত্তির হাতে সমর্পণ করে। আঠারো শতকের শেষের দিকে এখানে ঢাকার আর্মেনীয়'দের 'বিলিয়ার্ড ক্লাব' ছিল, স্থানীয়রা যাকে আন্টাঘর বলেই চিনতো। পরবর্তীতে ব্রিটিশ শাসনামলে ভিক্টোরিয়া পার্ক থেকে বর্তমানের বাহাদুর শাহ পার্ক। আশেপাশে জগন্নাথ কলেজসহ বেশ কিছু স্কুল, কলেজ থাকায় পুরুষ হয়ে পুরুষদের খুঁজে নিতে কোনোদিন অভাব পড়েনি ঢাকার সবচেয়ে প্রাচীন এই পাড়ায়।

মিরপুর মাজার

অনেকেই চমকে উঠছেন, ভাবছেন অধর্ম! তা কিছুটা হচ্ছে বৈকি। শাহ আলী বাগদাদী ফরিদপুর থেকে এসে মিরপুরের এই মাজার প্রাঙ্গনে অন্তর্ধানের আগ পর্যন্ত হয়তো জানতেন না যে তার নামেই

PDF
MOBILE SCANNER

একদিন এতো বড়ো একটা মাজার দাঁড়িয়ে যাবে। প্রতি বৃহস্পতিবার এখানে আসর বসে, ঢাক-ঢোল আর কাসার উন্মত্ত শব্দের সাথে চলে আধ্যাত্মিক গান, কিছুটা গঞ্জিকা সেবন। চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে সবাই সেসব উপভোগ করেন। একটু থামুন! কিছু টের পাচ্ছেন? এই গায়ে গা লেপ্টে যাওয়া ভিড়ের মধ্যে কেউ একজন আপনার প্যান্টের চেন ধরে টানাটানি করছে, উপর থেকে হাত বোলাচ্ছে আপনার শীর্ষাঙ্গে! ভয় পাবেন না, এখানে এমনটা আরো অনেক আগে থেকেই চলে আসছে। বলা যায় এই জায়গাটিও ঢাকার পুরনো স্থানগুলির মধ্যে একটি এবং আশ্চর্যজনকভাবে এই ভীড়-ভাট্টার মধ্যেই যা হবার সব হয়ে যায়! হয়তো টেরটিও পাবেন না কার হাত ঘুরে বেড়াচ্ছে আপনার সবচেয়ে দামী রত্নে!

ইত্তেফাকের মোড়

ঢাকার ব্যস্ততম রাস্তাগুলোতে দেয়ালে সাঁটা খবরের কাগজ পড়ার দৃশ্য নব্বই-এর দশকে বহু প্রচলিত থাকলেও এর চল বর্তমানে অনেকটা কমে গেছে। তবে এখনো এই প্রচলন টিকে থাকার মতো একটি স্থান হচ্ছে ঢাকার ইত্তেফাক মোড়। পত্রিকা কিনে টাকা অপচয় করতে চান না যারা, তাদের অনেকেই দিন-দুনিয়ার খবর নেয়ার ছলে অন্যের লিঙ্গ স্পর্শ করবার চেষ্টা হরহামেশাই করেন। হালকা ভীড়ের মাঝে সাধারণ জনতার কাছে এটা কোনো অর্থ বহন করবে না, বরং নিছক একটা ভুল। কিন্তু যাদের উদ্দেশ্য একই থাকে তারা ঠিকই সাড়া দেবেন। এভাবেই পৃথিবীর খবর নেয়ার ছলে অন্যের চাহিদার খবর নেয়াও হয়ে যায়। একদম সকালে অফিসগামী পুরুষেরা অফিসে যাবার সময় এই জায়গায়টি এরকম নানা গোপন তৎপরতায় সচল হয়ে উঠেন।

ফার্মগেট পার্ক

এটিকে ঢাকার অধুনা সংযোজনই বলা চলে। খুব বেশিদিন হয়নি যে এখানে রূপবানদের আনাগোনা শুরু হয়েছে। ঢাকার অন্যতম জনসমুদ্র ফার্মগেটের 'সেজান পয়েন্টে'র ঠিক উলটো দিকেই এই পার্কটির অবস্থান। বাহাদুর শাহ পার্কের মতো এখানেও সন্ধ্যার আঁধারের চাদর সাথে করে নিয়ে আসে কিছু মানুষের কাম, প্রেম আর প্রবৃত্তিকে যারা হয়তো ইন্টারনেটের ভুলভুলাইয়ায় নিজেদের হারাতে চান না কিংবা সেটি ব্যবহারের সুযোগ নেই। তাই যেন সান্ধ্য আঁধারে নিজের মতো কিছু মানুষকে খুঁজে নেবার জন্য ফার্মগেটের এই পার্কটিকেই ঢাকা বরাদ্দ হিসেবে রূপবানদের এখতিয়ারভুক্ত করেছে। কাউকে খুঁজে পাবার এই প্রচেষ্টা নিছক শরীরের চাহিদা হতে পারে, হতে পারে মনের চাহিদাও, তবে মোদ্দা কথা হলো-এ চাহিদা এড়াবার নয়। তাইতো তিন সন্তানের জনক হবার পরেও কেউ আসছেন ২৫ বছরের অবিবাহিত যুবকের সান্নিধ্য পেতে। আগাগোড়া পরীক্ষা করে বেছে নিচ্ছেন সঙ্গী, যে সুযোগটা হালের অনলাইনেও পাওয়া যায় না।

বাংলা মোটরের সিগন্যালে

ইত্তেফাকের মোড়ের মতো ঢাকার এই জায়গাটিতেও একইরকম খবরের কাগজ পড়বার ছলে নিজের চাহিদার কাউকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করা হয়। অন্যান্য জায়গাগুলির চাইতে এটি তুলনামূক নতুন বলা চলে। ■

Scanned with MOBILE SCANNER

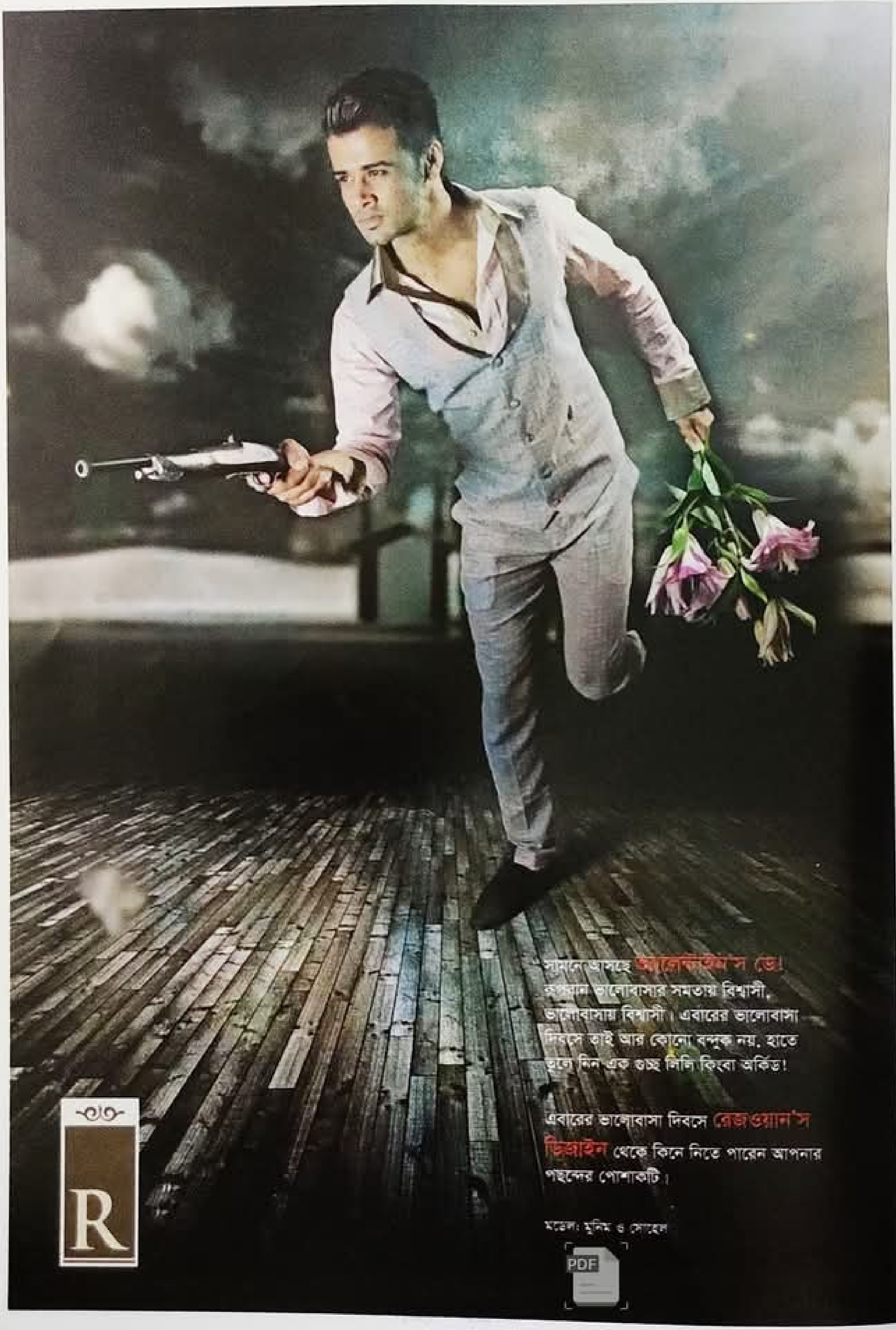
সামনে আসছে ভ্যালেন্টাইন'স ডে!
রেজওয়ান ভালোবাসার সমতায় বিশ্বাসী, ভালোবাসায় বিশ্বাসী। এবারের ভালোবাসা দিবসে তাই আর কোনো বন্দুক নয়, হাতে তুলে নিন এক গুচ্ছ লিলি কিংবা অর্কিড!
এবারের ভালোবাসা দিবসে রেজওয়ান'স ডিজাইন থেকে কিনে নিতে পারেন আপনার পছন্দের পোশাকটি।
মডেল: মুনিম ও সোহেল
R

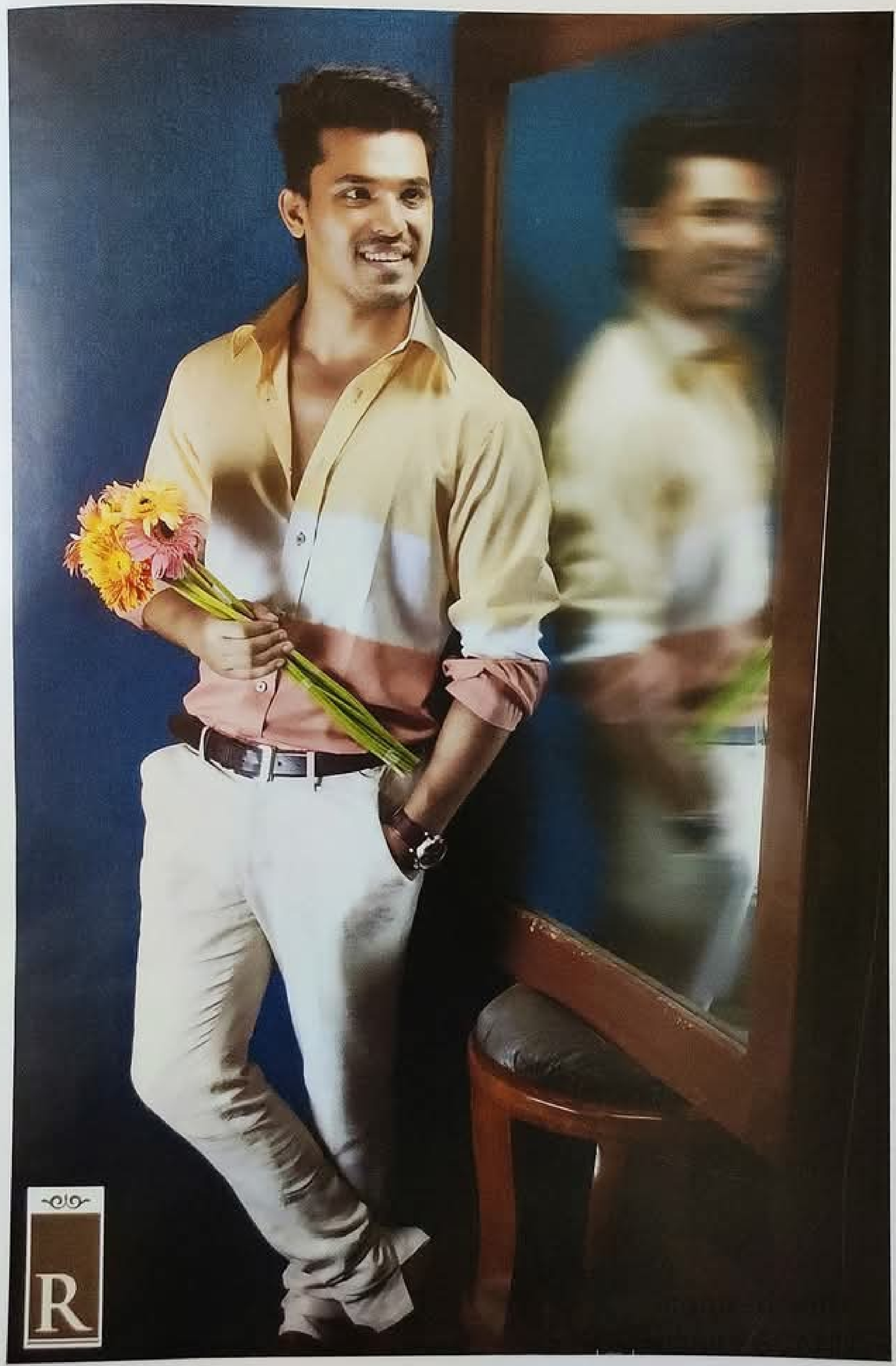

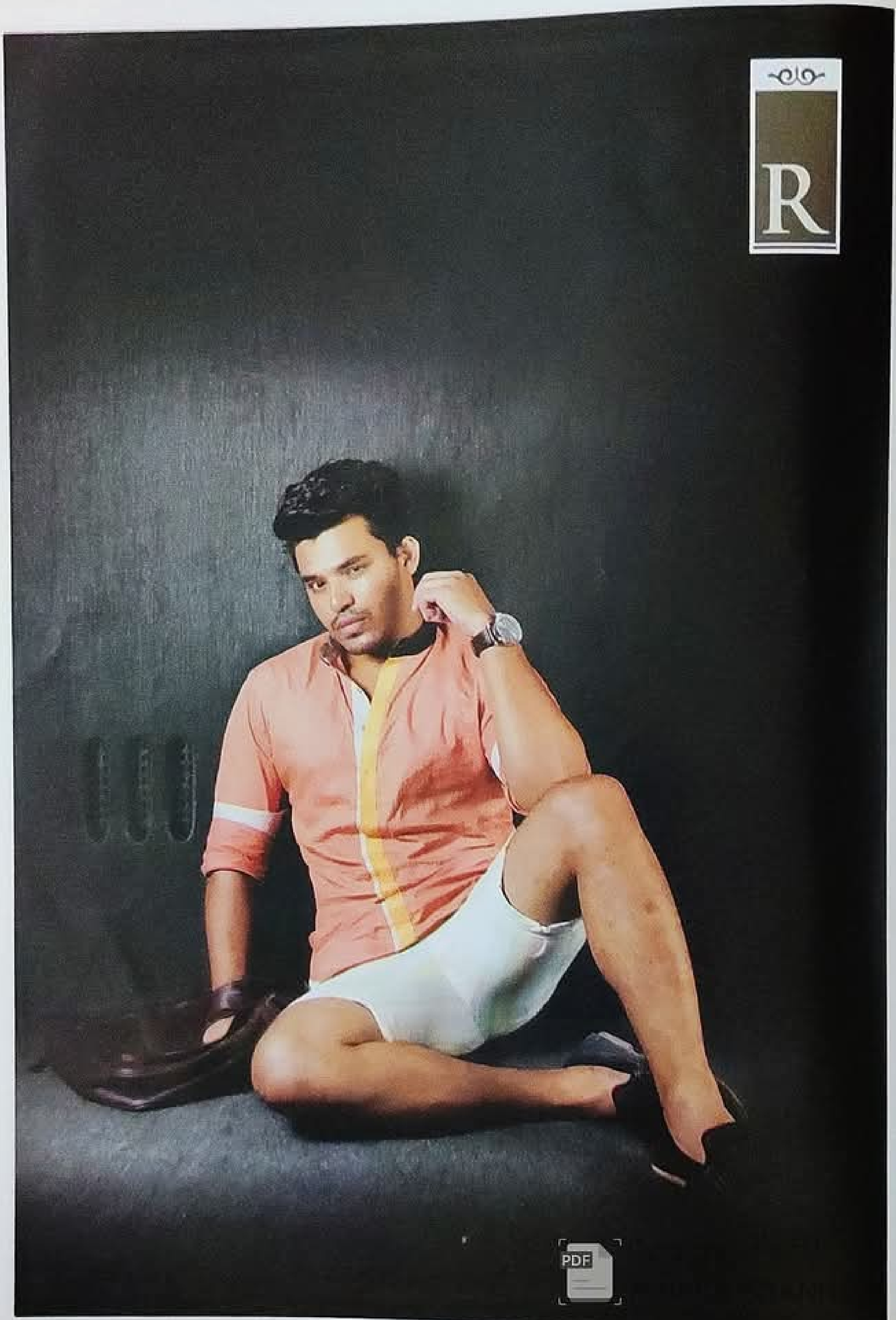

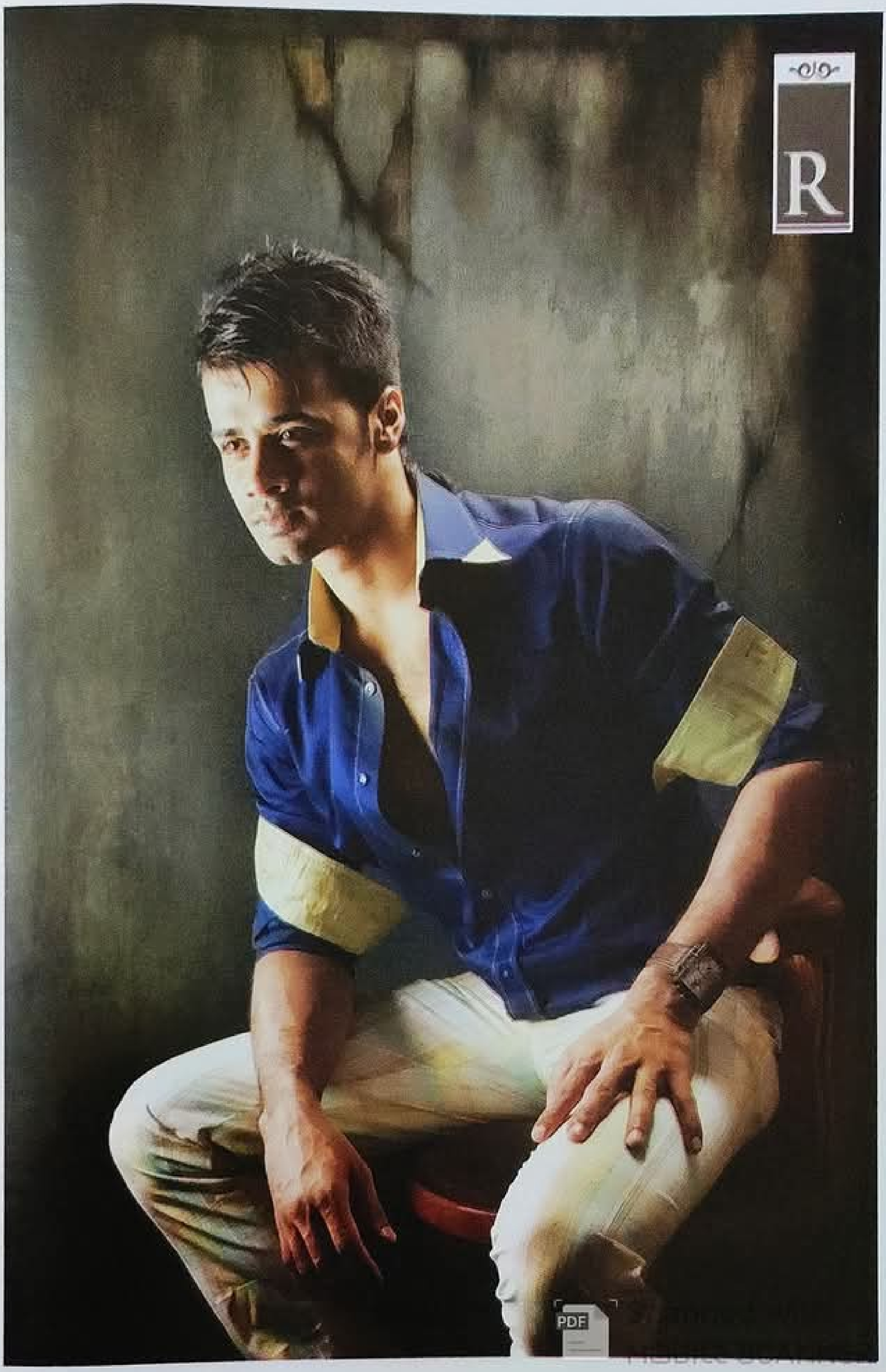

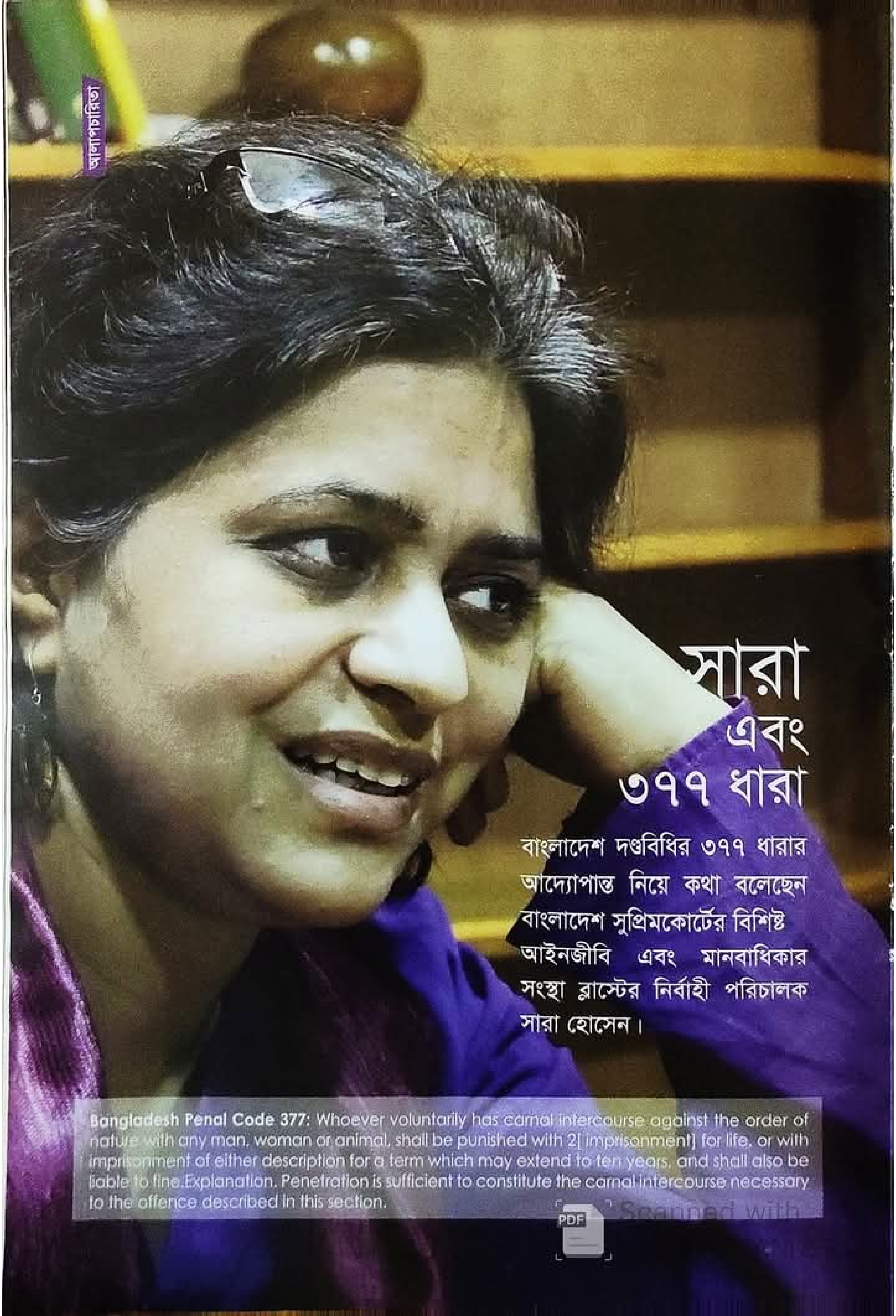

সারা এবং ৩৭৭ ধারা

বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারার আদ্যোপান্ত নিয়ে কথা বলেছেন বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবি এবং মানবাধিকার সংস্থা ব্লাস্টের নির্বাহী পরিচালক সারা হোসেন।

Bangladesh Penal Code 377: Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal, shall be punished with 2[imprisonment] for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.Explanation. Penetration is sufficient to constitute the carnal intercourse necessary to the offence described in this section.

Scanned with

প্রথমেই প্রশ্ন করি ৩৭৭ ধারাটা আসলে কি? বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ৩৭৭ ধারার মূল চিত্রটা কি?

সারা: ৩৭৭ ধারা আসলে উপনিবেশিক একটা আইন, বলা চলে একটা নির্দিষ্ট সময়ের আইন। ভিক্টোরিয়ান যুগে 'মোরালিটি' নিয়ে অনেক ধরনের রক্ষণশীল অবস্থান সে সমাজে ছিল, যার প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে এই আইনের সূত্রপাত। যেহেতু বিভিন্ন দেশে তাদের 'কলোনিয়াল' একটা উপস্থিতি ছিল, তার ফলেই ব্রিটিশ উপনিবেশের সমাপ্তি হলেও তাদের এই আইন আজও বলবৎ আছে অনেক দেশে। বাংলাদেশেও তারই ধারাবাহিকতা চলছে বলা যায়।

৩৭৭ ধারায় কি ধরনের অপরাধের কথা বলা হয়েছে?

সারা: ৩৭৭ ধারায় আসলে 'সো কলড আননেচারাল অফেন্স'কে 'ক্রিমিনালাইজ' করা হয়েছে। তবে মজার ব্যাপার হলো 'আননেচারাল অফেন্স' কি, সেটার কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা আইনে দেয়া নেই। এই ব্যাখ্যাটা অনেক সময় পূর্ববর্তী কোর্টের সিদ্ধান্ত থেকে দেখে নিতে হয়। বাংলাদেশে ৩৭৭ ধারায় যে কোনো মামলা হয়নি, সেটা কিন্তু নয়। কিন্তু আমাদের দেশের একটা 'লিগ্যাল প্র্যাকটিস' হলো, যে মামলাগুলো নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালত অর্থাৎ হাইকোর্ট অবধি যায়, কেবল সেগুলো নিয়েই পরে রিপোর্ট করা হয়। যেসব মামলা 'ট্রায়াল কোর্টে' আসে, সেগুলোর কোনো 'রেকর্ড' থাকে না। তাই ৩৭৭ ধারার কোনো কেস 'ট্রায়াল কোর্টে' এলেও সেটা নিয়ে গবেষণা করাটা মুশকিল। আমি আমার চল্লিশ বছরের কেস ঘাটার অভিজ্ঞতায় হাই কোর্টে মাত্র একটা ৩৭৭ ধারার মামলা পেয়েছি যাতে বলা ছিল যে পদ্ধতিগত ভুলের জন্য মামলাটা বাতিল হয়ে গেছে। এটা মূল আলোচনা বা ইস্যুতে উঠতেই পারেনি।

তাহলে 'আননেচারাল অফেন্স' বলতে আমরা কি কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা কোথাও পাবো না?

সারা: ঐ যে বললাম, এটা কোর্টের 'ডিসিশান' দেখে বলা যেত। আমাদের দেশে এরকম কোনো স্পষ্ট রায় নেই যেটা দেখে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়। কিন্তু ইন্ডিয়া বা পাকিস্তানে এরকম কিছু 'রেফারেন্স ডিসিশান' আছে। সত্যি বলতে এটাও আমাদের 'লিগ্যাল প্র্যাকটিসের' একটা অংশ যেখানে আমরা আমাদের কোর্টে কোনো স্পষ্ট রায় না দেখলে পার্শ্ববর্তী দেশে একই রকম আইন থাকলে তাদের সিদ্ধান্ত দেখি। আর সেটা থেকে দেখা যায় যে আমাদের প্রতিবেশী দুই দেশেই 'আননেচারাল অফেন্স' বলতে কিছু 'সেক্সুয়াল প্র্যাকটিস'কে বোঝানো হয়েছে। সেখানে কেবল সমকামী নয়, বিষমকামী বা অন্য যে কোন যৌন প্রবৃত্তির লোকের ক্ষেত্রেও এটাকে 'আননেচারাল অফেন্স' হিসেবে রায় দেয়া হয়েছে। তবে এটা কেবল আইনের ব্যাখ্যা, বাস্তবে মূলত সমকামীদের বিরুদ্ধেই এই আইন ব্যবহার হয়ে আসছে। স্পষ্টতই আইনের অপব্যবহার বা বৈষম্য সেটা।

কোনো ধরনের ব্যবহার বা আচরণ যদি অন্য কারো ক্ষতি না করে, সেটা আইন করে নিষিদ্ধ করা আসলে কতটা মানবিক?

সারা: আচ্ছা, প্রথমেই এই প্রশ্নের জবাব 'ফিলোসফিক্যালি' দেয়া যেতে পারে। 'নেচারাল' বা 'আননেচারাল' বলতে আমরা আসলে কি বুঝি? আর এই জিনিসগুলি কি ক্ষেত্র বিশেষে পালটাতে পারে নাকি সার্বজনীন ধ্রুবক? যদি কোন কিছু কাউকে জোর করে করানো হয় তবে সেটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু দুজন প্রাপ্তবয়স্কের সর্বসম্মতিতে যেটা হচ্ছে, যা তাদের শারিরীক বা মানসিক তৃপ্তি দেয়, সেটায় তো কারো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। আইন কেন সেটাকে

> যদি সংগঠন করতে চান, তাহলে সেটা ৩৭৭-এর মতো একটা 'স্টুপিড ল'কে কেন্দ্র করে না করাই ভালো, যেটা কিনা সমস্যার একটা অংশ মাত্র, কখনোই মূল সমস্যা নয়।

'অফেন্স' হিসেবে নিবে? 'বেসিক প্রিন্সিপাল অফ ডেমোক্রেসি এও লিবারেলিজমে'ও এই আইন টেকার কথা না। তবে আমাদের দেশে কিছু বৈজ্ঞানিক বাধা আছে হয়তো, বাংলাদেশে আসলে কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়নি এসব নিয়ে। পশ্চিমে পঞ্চাশের আগেই বোধহয় 'নেচারাল' বা 'আননেচারাল' কি এসব ব্যাপার নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালু হয় এবং মতামত দেয়া হয় যে কোন কিছুইকে সার্বজনীন বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টাটা আসলে অর্থহীন। বাংলাদেশে আইসিডিডিআরবি বা এরকম কোনো সংস্থা গবেষণা করে দেখতে পারে যে এরকম যৌন আচরণের ফলে সমাজে কোনো ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে কিনা। আর যদি তা না হয় তবে 'কলোনিয়াল' একটা আইনের উপর ভিত্তি করেই কি কেবল একে 'আননেচারাল অফেন্স' বলা সমুচীন কিনা, সেটা ভাবার সময় এসেছে।

বাংলাদেশে এই আইনের দেখভাল করা বা পরিবর্তনের জন্য কি কেউ নেই তবে?

সারা: অবশ্যই আছে, আইন কমিশন আছে। তাদের মূল কাজ হচ্ছে কোনো আইন সংবিধান সম্মত কিনা সেটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। আমাদের দেশে কিন্তু অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয় মূলত রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে। এই রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণেই হয়তো উপনিবেশিক একটা আইন নিয়ে প্রশ্ন তোলার জায়গাটা সংকুচিত হয়েছে ক্রমেই। বিগত ২৫ বছরে আইন কমিশনের পুনর্গঠন হয়েছে, নতুন মানবাধিকার কমিশন হয়েছে যাদের মূল কাজগুলোর একটি হলো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোর সাথে আমাদের জাতীয় আইনগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা সেটা দেখা। সব সরকারই এসব আইন সংবিধানের মূল নিয়ম পরিপন্থী কিনা সেসব না দেখেই প্রচুর মন্তব্য করে থাকেন। উনারা নিজেরাই হুট করে কোনো মন্তব্য না করে বিশেষজ্ঞ বা তাদের বাইরে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের মতামতও নিতে পারেন। আবার যাদের জীবনে এই আইনের প্রভাব আছে, যেকোনো গণতান্ত্রিক দেশে তাদের মতামত নেয়াটাও অত্যাবশ্যক।

কেউ কি এই আইন নিয়ে প্রশ্ন তুলে মামলা করতে পারে?

সারা: অবশ্যই পারে, সংবিধান তৈরির আগে যত আইন হয়েছে তার সবগুলো নিয়েই প্রশ্ন করা যেতে পারে।

বর্তমানে ৩৭৭ ধারা নিয়ে বাংলাদেশে আশংকা করবার মতো কোনো অবস্থা কি আসলেই আছে বলে আপনার মনে হয়?

সারা: সত্যি বলতে না, এই ধারার কোনো মারাত্মক 'এপিডেমিক' এখনো বাংলাদেশে নেই যেখানে কিছুক্ষণ পরপর পুলিশ এই আইনে কাউকে ধরে নিয়ে গিয়ে 'হ্যারাস' করছে। তবে একদম যে হচ্ছে না, তাও আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি না। নিম্ন আদালতে হয়তো এরকম অনেক কেস আছে যেগুলো ফাইলের স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। তার মধ্য থেকে কোনরকম 'আপডেটেড সিস্টেম' ছাড়া 'ম্যানুয়ালি' এসব কেস বের করা প্রায় অসম্ভব।

Scanned with MOBILE SCANNER

আচ্ছা, আইনী ব্যাপারগুলি তো গেল, আইন তৈরিতে তো সমাজের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে, সে ব্যাপারে কিছু বলবেন?

সারা: 'পলিটিক্যাল পজিশন' এবং 'সোশাল কনটেক্সট' দুটোই খুব দরকারী। এই দুয়ের মিশেলে তৈরি এক জালের মধ্যে ৩৭৭ ধারা আটকে আছে বলা চলে। একদিকে ধর্মীয় সংগঠনগুলো এটাকে অনৈতিক বলে হুংকার ছাড়ছে আর অন্যদিকে যারা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ দাবি করছে, তারাও কিন্তু সেই খেলার বাইরে নয়। ড. ইউনূসের ব্যাপারটাই দেখুন। উনার 'স্টেটমেন্ট'টা কিন্তু এমন আহামরি কিছু না। শুধু 'হোমোসেক্সুয়াল প্রসেকিউশন' না করবার জন্য একটা সাইন, উগাণ্ডাতে একজন 'এলজিবিটি এক্টিভিস্ট' খুন হয়ে গেল সেই প্রেক্ষিতে। তাও সেই কবের কথা সেটা। সেটা নিয়ে এত কাণ্ড হবার পেছনেও কিন্তু সমকামিতার চেয়ে নির্দিষ্ট ভাবে ইউনূস সাহেবের বিরুদ্ধে এক পক্ষের 'অফিশিয়াল পজিশন'টা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সবটাই রাজনীতির খেলা। তবে পুরো ব্যাপারটার সবচেয়ে বাজে দিকটা যেটা সেটা হল ইউনূসের মতো একজন ব্যক্তিও আক্রান্ত হতে পারেন, তো এই ব্যাপার নিয়ে আমরা যারা কথা বলছিলাম এতদিন, স্বাভাবিকভাবেই তারা সবাই একটু গুটিয়ে গেছি এই ঘটনার পরে।

এই আইন নিয়ে নাড়াচাড়া করাটা কি তাহলে আদৌ কোনোদিন বাংলাদেশে হচ্ছে না?

সারা: ৩৭৭ ধারা থাকবে কি থাকবে না, সেসব নিয়ে অবশ্যই কথা হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের 'প্রায়রোটাইজেশন' করতে হবে। আমাদের খুঁজে বের করতে হবে ৩৭৭ ধারাই কি আমাদের মূল শত্রু বর্তমানে নাকি অন্যান্য ইস্যু যেগুলো এই আইনী সমস্যাকে ঘনীভূত করতে পারে। আমার এক বন্ধু রয়েছে যার ক্ষেত্রে আমি দেখি মূল সমস্যাটা পরিবারেই আটকে আছে। তাকে বাধ্য হয়ে একটা দ্বৈত জীবন পালন করতে হচ্ছে কাউকে কিছু না বলতে পেরে। আমার মতে এটাকেই আগে দূর করবার চেষ্টা করা উচিত। মুক্তভাবে নিজেকে প্রকাশের একটা 'স্পেস' থাকা উচিত সবার আগে, তার পরে না লিগ্যাল ব্যাটল'! এখনই যদি আমরা 'লিগ্যাল ব্যাটলে' যাই, সেক্ষেত্রে হারার সম্ভাবনাই বেশি।

কয়েকদিন আগে পুজা, সানজিদা নামে দুই মেয়ের এরকম একটা ঘটনা প্রকাশ পায়, সেক্ষেত্রে আইনী প্রক্রিয়ায় কি ঘটেছিল আসলে?

সারা: আচ্ছা, এই কেসে একটা মেয়ে যে জেল খাটলো, আমরা তার জামিনের কেসটা নিয়েছিলাম। এ ব্যাপারে একটা মজার অভিজ্ঞতা বলি। যে অফিসার গ্রেফতারের সময়টায় ছিল, তিনি আমাকে বললেন,"দেখেন এটা ধর্মবিরোধী বা অনৈতিক কিনা আমি জানি না, কিন্তু ৩৭৭ ধারাতো লেসবিয়ানদের উপর লাগু করা যায় না!" আসলেই কিন্তু তাই। উনি ওরকম একটা জায়গায় থেকেও যে এতটা জানেন, সেটা আমাকে বিস্মিত করে। তবে এতকিছুর পরেও একজনকে তো দুই মাস জেলে থাকতেই হল। কয়েকদিন আগে ফেনীতেও এমন একটা ঘটনা ঘটে। মনে রাখা ভালো যে আমাদের দেশের 'পাবলিক রিএকশন' কিন্তু অতোটা খারাপ না যতোটা আমরা ভেবে নিই। আমাদের ধর্মীয় 'প্র্যাক্টিস'ও কিন্তু একেবারে 'মিডল ইস্টের' মতো না।

কেউ ৩৭৭ ধারায় গ্রেফতার হলে কি রকম আইনী সাহায্য পেতে পারে? কোনো সংস্থা কি আছে সাহায্যের জন্য?

সারা: অবশ্যই! যারা আইনী সাহায্য দিচ্ছে তারা সবাই করবে। বন্ধু, ব্লাস্ট, আইন ও সালিশ কেন্দ্র-এরা সবাই সাহায্য করতে পারে। তবে এখন অবধি আমার জানামতে কেউ এমন কেসে লড়েনি।

৩৭৭ ধারায় কেউ গ্রেফতার হলে প্রাথমিকভাবে কি কি হতে পারে তার সাথে?

সারা: সরাসরি এই ধারায় গ্রেফতার হলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে চালান হবে। গ্রেফতারের পরপরই আপনার ল'ইয়ার নিয়োগ করা উচিত যাতে কোর্টে জামিন চাইতে পারেন। তবে শারিরীক বা মানসিক ঝুঁকি তো থেকেই যায়। এরকম কোনো কেস এর আগে হয়নি, পুজা আর সানজিদার কেসেও এরকম 'আননেচারাল অফেন্স' এর অভিযোগ আনা হলে আমরা হয়তো লড়তে পারতাম, 'আননেচারাল অফেন্স' কি সেটার ব্যাখ্যা চাইতে পারতাম । যদি কেস হয়ে যায় তবে তিন পদ্ধতিতে কাজ করা যায়, প্রথমেই কেসের পদ্ধতিগত ভুল নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, যেটা হয়তো ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে না হলেও হাইকোর্টে সম্ভব। কেসটা ঠিকভাবে ফাইল করা কিনা বা অন্য কোনো 'জুডিশিয়াল' ত্রুটি ধরে কেসটাকে চ্যালেঞ্জ করা যায় কিনা সেটা দেখতে হবে। দ্বিতীয়ত, মামলাটা যদি হয়েই যায় তবে আপনি নিজেকে 'ডিফেন্ড' করতে পারেন যে, আপনার বিরুদ্ধে আনা 'চার্জ'টি সঠিক নয়। আর সবশেষে যদি আপনার বিরুদ্ধে আনা 'চার্জ'টি সত্য প্রমাণিত হয়েই যায় তবে আপনি এই আইনকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। সেটা হবে সবশেষ পন্থা।

ফেনীতে একটি ছেলে ধরা পড়েছিল, যাকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার দেখানো হয়। ৩৭৭ এবং ৫৪ ধারার মধ্যে কি কোনো সংযোগ আছে?

সারা: হ্যাঁ, আসলেই একটা সংযোগ আছে। ৫৪ ধারা হচ্ছে কাউকে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বশে গ্রেফতার করা। যেকোনো ধরনের অপরাধের সন্দেহে যে কাউকে ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করা যায়। তবে এক্ষেত্রে আমাদের পুলিশরা স্বাভাবিকভাবেই 'যুক্তিসঙ্গত' কোনো কারণের ধার ধারেন না। এই আইনের ক্ষেত্রে সংবিধানে সুস্পষ্ট কিছু নির্দেশ আছে। আপনি যদি গ্রেফতার হন এই ধারায়, পুলিশের কাছে প্রথমেই আপনার গ্রেফতারের কারণ স্পষ্টভাবে জানতে চাইতে পারেন এবং পুলিশ সেটা জানাতে বাধ্য। যে পুলিশ আপনাকে গ্রেফতার করবে তার নাম এবং পদবীও আপনি জানতে চাইতে পারেন। দ্বিতীয়ত আপনাকে আপনার উকিল এবং একজন পরিবারের সদস্যের সাথে যোগাযোগ করতে দিতে হবে। এছাড়াও আপনাকে গ্রেফতার করে যদি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নেবার চেষ্টা করে তাহলে রিমাণ্ডের আগে আপনি অবশ্যই আপনার 'মেডিক্যাল এক্সামিনেশন' করাতে চাইবেন। ৫৪ ধারা আর ৩৭৭-এর যোগাযোগটা হচ্ছে যে ৩৭৭ ধারার অফেন্স হচ্ছে, এই সন্দেহ করে যে কাউকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করা যেতে পারে। বাংলাদেশে ৩৭৭ ধারায় কেস না হলেও ৫৪ ধারায় এমন অনেক কেস কিন্তু ব্লাস্টের কাছেও এসেছে।

আমাদের দেশে আম[illegible] এই ধারায় কোনো পরিবর্তন আনতে

Scanned with MOBILE SCANNER

চাই তাহলে আমরা কি করতে পারি?

(এই সাক্ষাৎকারটি ১১ ডিসেম্বর ২০১৩-এর আগে নেয়া হয়। এই কারণে সম্প্রতি ইন্ডিয়ান সুপ্রিম কোর্টে ৩৭৭ ধারা নিয়ে যে রায় হয়েছে সেই প্রসঙ্গ এখানে আসেনি)

সারাঃ ইন্ডিয়া'তে কিভাবে পরিবর্তনটা এসেছে সেটা দেখা যেতে পারে। উনাদের কিন্তু কেবলমাত্র আইনী লড়াই-ই চলেনি, পাশাপাশি সামাজিক আন্দোলন, মিডিয়া, টিভি, এড কিংবা কাগজে বিস্তর লেখালেখি চলেছে। এই কেসটার কিন্তু 'হাইকোর্ট জাজমেন্ট' পর্যন্ত যেতে দশ বছর সময় লেগেছে। এই দশ বছরে আইনজীবিরাও সময় পেয়েছেন জনগণের 'পাল্‌স' বুঝতে পারার জন্য। কেসটা লড়ার সময় নানা 'প্রোগ্রেসিভ' দলের জন্মও হয় যার মধ্যে 'ভয়েস এগেইনস্ট ৩৭৭' অন্যতম। এরা আসলে অনেকগুলো সংগঠনের সমন্বয়ে তৈরি একটা 'প্লাটফর্ম' যেখানে অনেক নারী বা মানবাধিকার

সংগঠনও ছিল, যাদের মূল লক্ষ্য কিন্তু কেবল ৩৭৭ 'রিপিল' করা ছিল না। আর কোর্ট কিন্তু আইনটা বাতিল করেনি বা তুলে দেয়নি। কোর্ট বলেছে দুইজন প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে সম্মতিক্রমে স্থাপিত যৌন সম্পর্ক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা যাবে না। আপনাদের তাই উচিত হবে ৩৭৭ নিয়ে নাড়াচাড়া করবার সাথে সাথে সমাজকে সমানতালে বোঝানো যে, এই আইনটা মানুষের মৌলিক ব্যক্তিস্বাধীনতা পরিপন্থী। অনলাইনে নানারকম 'হেট স্পিস' দেখা যায় ইদানীং, সেসব যুদ্ধক্ষেত্রে আপনাদের জড়িয়ে পড়তে হবে। দশটা 'নেগেটিভ' মন্তব্য আসলে আপনারা বিশটা 'পজিটিভ' মন্তব্য করুন, বসে গেলে চলবে না।

আমরা যদি আসলেই একটা সাংগঠনিক রূপে যেতে চাই তবে সেটা কিসের ভিত্তিতে হতে পারে? আমাদের দেশে যেহেতু যৌনতার সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা কম, সেহেতু আমাদের মূল 'ফোকাস' কি অন্যরকম হওয়া উচিত?

সারাঃ আমি একটা পরামর্শ দিতে পারি, যদি সংগঠন করতে চান, তাহলে সেটা ৩৭৭-এর মতো একটা 'স্টুপিড ল'কে কেন্দ্র করে না করাই ভালো, যেটা কিনা সমস্যার একটা অংশ মাত্র, কখনোই মূল সমস্যা নয়। সমান অধিকার কিংবা সমগ্রহণযোগ্যতা-কেন্দ্রিক সংগঠন করতে পারেন। এক্ষেত্রে ভালোবাসা যেহেতু আমাদের দেশে যৌনতার চাইতে বেশি গ্রহণযোগ্য, সেটাকে কেন্দ্র করে এগিয়ে যাওয়া বেশ ভালো একটা 'স্ট্র্যাটেজি' হতে পারে। পৃথিবীর অন্য সব দেশেও কিন্তু ধাপে ধাপে ব্যাপারগুলি হয়। হুট করে ৩৭৭ ধারার বিলুপ্ত হলেই যে সবার অধিকার প্রতিষ্ঠা পেয়ে যাবে এমন নয়। ইউএসএ-তে এখন 'ইকুয়াল ম্যারেজ ল' হচ্ছে, আমরাও যদি এখন একই রকম আইন করি তবে আমাদের ধর্মীয় আইনগুলি যাবে কই, যেখানে হিন্দু মুসলমান বিয়েই এখনো 'ভ্যালিড' না! এইজন্য আপনাদের উচিত হবে বিয়ে বা 'ফ্যামিলি ল' এর মতো স্পর্শকাতর বিষয়গুলিতে এখনই হাত না দেয়া। বরং শিক্ষা, স্বাস্থ্য কিংবা মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোর সাহায্য নিয়ে এই বিষয়টাকে সামনে আনা যেতে পারে।

এসব আন্দোলনের কথা যদি আসে, কাউকে তো সেটা চালিয়ে নিতে হবে?

সারাঃ হ্যাঁ, অবশ্যই! 'ভয়েস' এবং 'নয়েস' দুটোই তৈরি করতে হবে। আমি বাংলাদেশী আইনী প্রক্রিয়ার একটা অংশ হয়েই আপনাদের বলতে পারি যে 'লিগ্যাল সিস্টেমের' উপর আপনাদের ভরসা না করাই ভালো। ইন্ডিয়াতেও 'নাজ জাজমেন্ট' কোনো সমাধান ছিল না। সমাজে ইতিমধ্যে সেই 'জাজমেন্ট' মেনে নেবার মানসিকতা তৈরিটাই আসল সমাধান ছিল। বাংলাদেশে ফতোয়া নিয়ে যে রায় হয়, সেটা হতেও কিন্তু দশ বছর সময় লেগে যায়। এই বিশাল সময়টায় আমরা ফতোয়ার বিরুদ্ধে এক ধরনের সামাজিক অবস্থান তৈরি করি। সেকারণেই কিন্তু আইনটা গ্রহণযোগ্যতা পায় দ্রুত। পরিবারকেও বোঝাতে হবে। পারিবারিক গ্রহণযোগ্যতা কিন্তু হাইকোর্টের গ্রহণযোগ্যতা থেকে অনেক বেশি দরকারী। এক্ষেত্রে নানারকম 'টেরিবল স্টোরি' যেগুলো কিনা আপনাদের মাঝে নানারকম বিষাদ বা অপ্রাপ্তি থেকে তৈরি হচ্ছে, আপনারা সেগুলো 'হাইলাইট' করতে পারেন। 'আউটরেজিয়াস মিসট্রিটমেন্ট'গুলি কিন্তু মানুষকে নাড়া দেয়, এগুলি না উঠলে অনেকের পক্ষেই হয়তো ভাবা কষ্টকর হয়ে যাবে যে, আপনাদের মূল সমস্যার জায়গাগুলি কি, আপনারা কেন এই আইনের বিপক্ষে। কেউ পরিবার থেকে বিতাড়িত হলে, কোনোরকম নির্যাতনের শিকার হলে সেসব গল্প আপনাদের আরো বেশি করে বলা উচিত। ভালোবাসার দায়ে কাউকে জেলে পোরাটাতো অমানবিক একটা ব্যাপার! আর এক্ষেত্রে আমি বলবো 'ডকুমেন্টেশন' জিনিসটা খুব দরকারী। আপনার প্রবৃত্তির ভিত্তিতে আপনি স্কুলে চান্স পেলেন না বা চাকরি ছাড়া হলেন বা আপনি বাচ্চা 'এডপ্ট' করতে পারলেন না, এই সবকিছুর উপযুক্ত 'ডকুমেন্টেশন' হওয়া প্রয়োজন। আমি যে আইন কমিশনে একটা লেখা দিব, আমি তো একটা 'সিংগেল পিস' লেখাও পেলাম না, তো লিখবো কিভাবে!

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সারা আপা, সবশেষে আপনি নিজ থেকে যদি কিছু বলতে চান।

সারাঃ আপনাদেরকেও ধন্যবাদ। ভালো লাগছে যে একটা 'কমিউনিটি সেন্স' তৈরি হচ্ছে দেখে। সমান অধিকারের ব্যাপারটা তো কোনো আন্তর্জাতিক এজেন্ডা নয়, এটা আমাদের নিজেদের সমস্যা, আমাদের দেশের প্রেক্ষিতেই এর সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে। আমার পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য অনেক শুভকামনা রইলো। ■

PDF MOBILE SCANNER

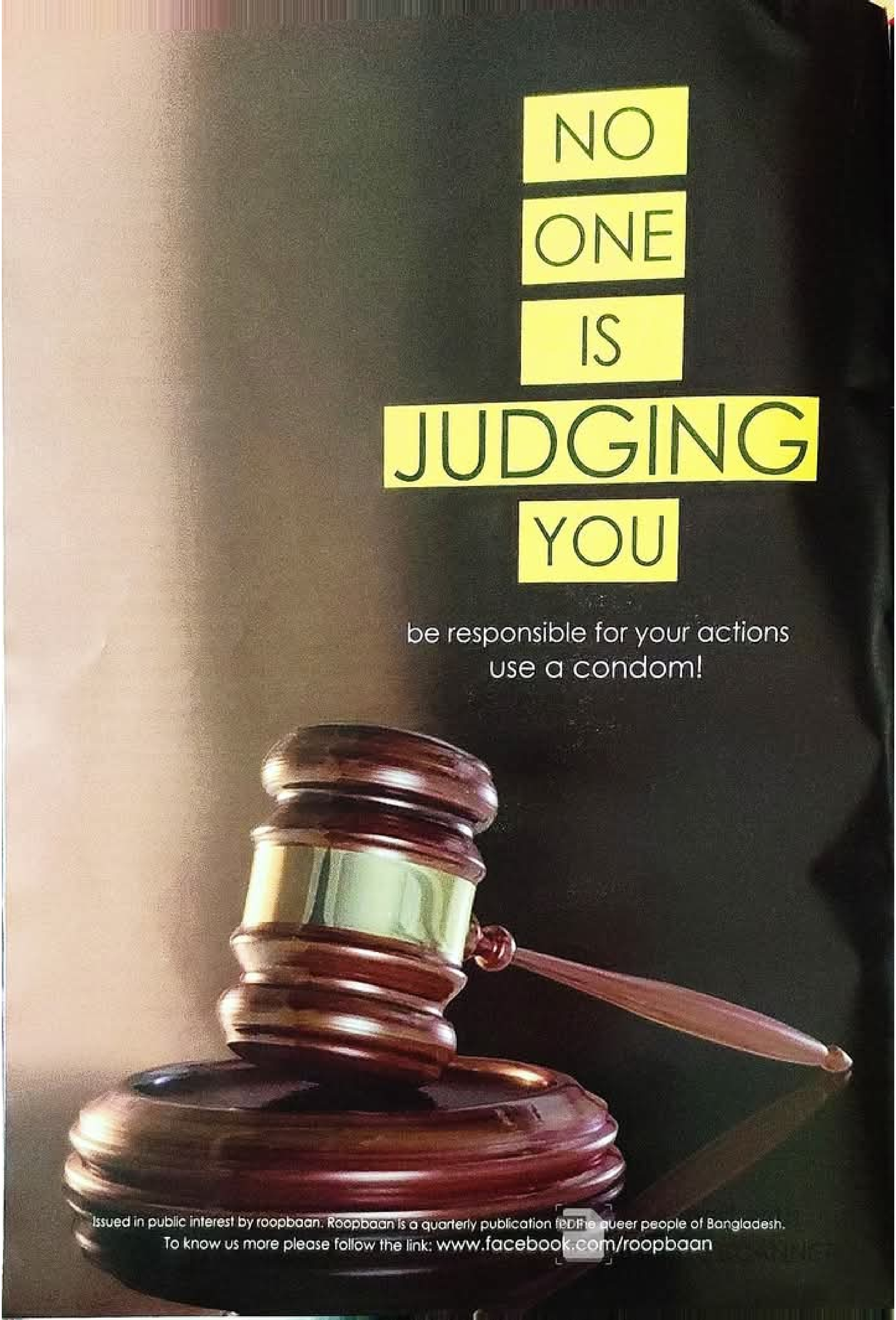
NO
ONE
IS
JUDGING
YOU
be responsible for your actions
use a condom!
Issued in public interest by roopbaan. Roopbaan is a quarterly publication for the queer people of Bangladesh.
To know us more please follow the link: www.facebook.com/roopbaan

কাঠের স্কেল

এবং এক আধদিন মনে হয় ফেলে আসা স্কুলের বেঞ্চ আর কাঠের স্কেলের কথা। সবুজ টেনিস বলের মতো শৈশব বেরিয়ে গেছে গেটের নিচ দিয়ে। একটি নিরুত্তাপ হলদে গল্প ছিল রাঁধাচূড়া গাছটি নিয়ে। তুমি কিংবা কাগজী লেবুর গন্ধ। বেগুনি পাখির পালক। একদিন জমাট মেঘ বৃষ্টি হলো।

সন্ধ্যা আর গোধূলি যে কী ঝগড়াটে তুমি যদি জানতে! প্রতিটা দিন ওদের দ্বন্দ্ব চলে.. গোধূলি হরেক রঙে আকাশ সাজিয়ে গোঁ ধরে বসে থাকে, সে যাবেই না। আর সন্ধ্যেটা মুখ কালো করতে করতে আকাশের রঙ মুছে দিতে থাকে। কিছুটা ধূসর স্মৃতিবোধে এই যে পারস্পরিক রঙের ফারাক, কিছু গল্প ভুলে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

হ্রদের নিচে নাকি তার ঘর! সাঁতার জানিনা বলে কোনোদিন আমার দেখাই হলো না পরখ করে... তুমি তো সাঁতার জানো... যাবে? মসৃণ অন্ধকার, ভারী রাত। যেখানে কোনো ভোর নেই, চাঁদ নেই, গ্রহ-নক্ষত্র কিংবা কৃষ্ণগহ্বরে নক্ষত্র পতন নেই। দুঃস্বপ্নের রাত অনেক দীর্ঘ...সেখানে বাতিওয়ালা বাতি জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে ক্লান্ত হয়, চোখের তারা, ভোর দেখার স্বপ্নে বিভোর, তবুও, ভোর অভিমানী।

আইসিইউ...!!! কাঁচ ঘেরা সুনসান শীতল নীরবতা। মাথার উপর কেউ যান্ত্রিক চোখে চেয়ে আছে। চারদিকের নীরবতার মধ্যে, পাইপ চুঁয়ে পড়া ফোটাটার শব্দই যেন বড় হয়ে কানে বাজে। এখনো বর্ষা শেষে বকের অলস স্থান পরিবর্তনে পাতার চোয়ানো জল শরতের শিউলির মতো নিরিবিলি ঝরে...আমাকে তেমাথায় রেখে আগামীর ভেতর ঠক্ ঠক্ শব্দ তুলে ঘোড়সাওয়ার অনেক আগেই পাড়ি দিয়েছে। পাড়ি দিয়েছে কাঠবিড়ালীর মতো সুরুৎ করে সরে পড়া শ্রাবণের রোদ।

দিঘীরপাড়ে আলো ছড়ায় জোনাকির দল। পঙ্ক আমারই থাক, পঙ্কজটা নিও।

অন্য কোথাও। গ্রাম, নদী, বৃক্ষ, মাঠের সীমান্তে সাদা আলো ছড়ানো কাশফুলের মেলা আমি পেরিয়ে এসেছি। হঠাৎ কোনোদিন যদি আসো দেখবে একটা কাক রোজ রোজ আসে, আমি যে ওকে খেতে দেই... তাই। আর আসে কিছু শালিক, চড়ুই, ... আর কবুতরও। কত মাছরাঙার সাথে পাল্লা দেয়া ক্ষণ, নাম না জানা ঝোঁপে শিশির মেখে লুকোচুরি করা ভোর ও বিকেল।

মাঝে মাঝে যে-কোনো বিস্তর অবসর পেলে ভাবি- এই যে এইসব বাক্য- যাকে আমি লিখি লিখি করেও ঠিক লিখতে পারি না - তার কি আছে কিছু হারানোর মতো স্মৃতি? আমার ভাবনায় প্রহরের পর প্রহর খেলে গোল্লাছুট, এক্কাদোক্কা। পথের পাশে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে পুকুরের পানিতে প্রতিবিম্ব ছড়ানো দুপাশের ঘনঘাস, গায়ে গা লাগিয়ে বেগুনি কচুরিপানা।

এবং এই যে এই বিস্তর জানালা, যেখানে আমি সেকেলে দু-পাল্লার হু হু খোলা ভেসে আসা বেলি ফুলের গন্ধ বোধ করি, তার কাল্পনিক কার্ণিশে প্রতিদিন জমে যাচ্ছে ধুলো। জানি সব চিল বুড়ো হয়ে গেছে। তবুও আমার জন্য নিয়ে এসো তোমার আস্ত একটা দিন। হ্রদ-বন-নদী-নৌকো-গাছের নিচে বসবার ক্ষণ-ছোট্ট ছিপছিপে একটা নৌকা, পড়ন্ত বিকেল কিংবা 'ঝিঁঝি' ডাকা সন্ধ্যা এসমস্ত জমিয়ে জমিয়ে পাখির বাসায় লুকিয়ে রাখছি কেবল... তুমি শুধু প্রাণ উপচে পড়া দিনটুকু এনো

জুয়েইরিয়াহ মৌ-এর ইমেজোগ্রাফি অবলম্বনে

anned with

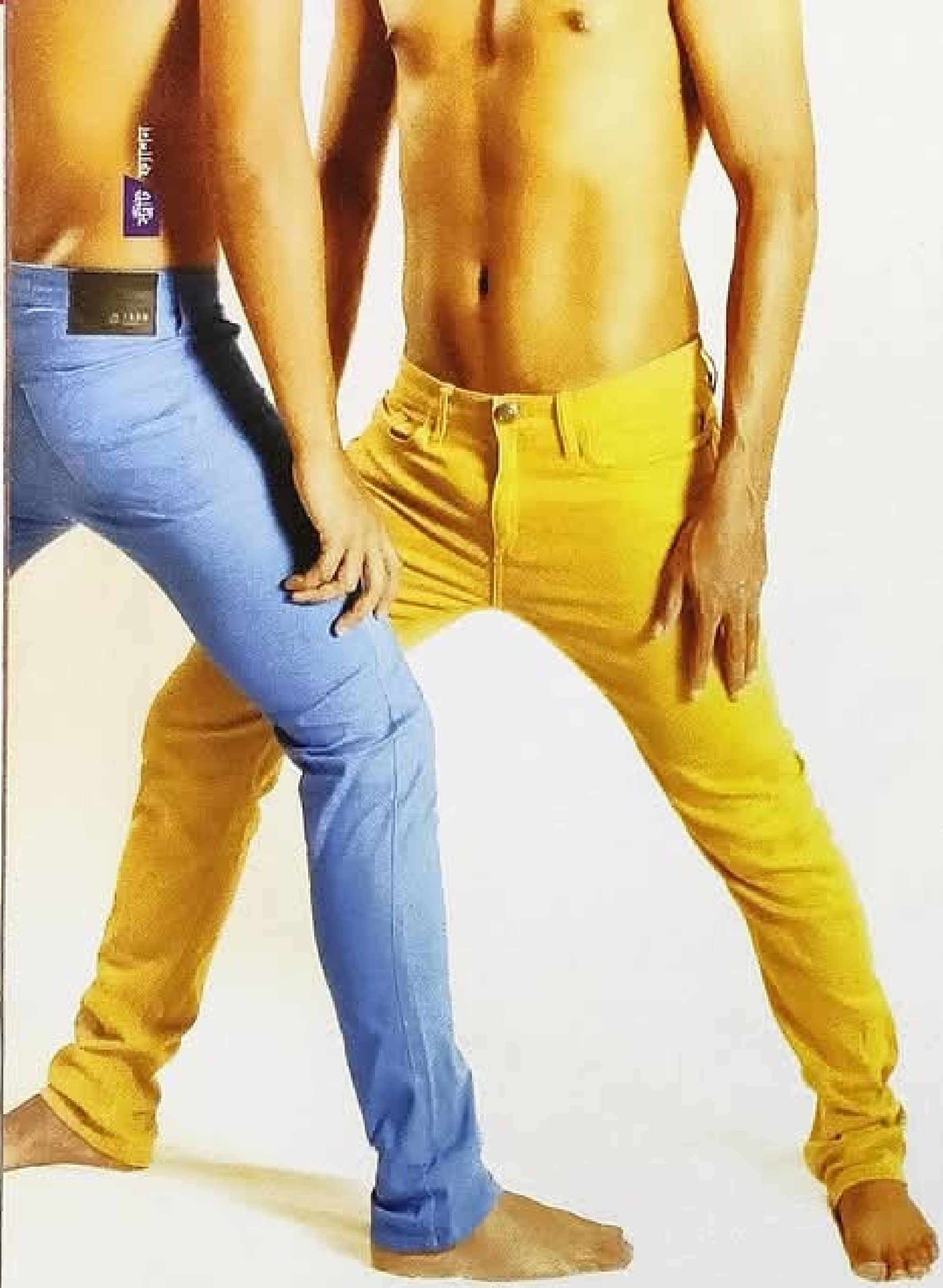

কালার বটম

শপিং-এ বের হয়েছিল এক বড় ভাই। আমি সঙ্গী কেবল। কিন্তু শপিংমলগুলোতে রকমারি পণ্যের ভিড়ে দুএকটা পছন্দ হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। তবে সেই পছন্দটা আর্টিস্টি-এর মতো ব্র্যান্ড শপে গিয়ে হবে কিংবা পোশাকটা যে একটা সেদ্ধ জলপাই রঙের একটা রঙিন প্যান্টালুন হবে, এই ব্যাপারটা আমার জন্য কিছুটা অস্বাভাবিক।

এ ধাঁচের প্যান্টগুলো আজকাল বেশ চলছে। প্রায়ই চোখে পড়া পোশাকটি এখন ঢাকা কিংবা চট্টগ্রামের স্ট্রিট ফ্যাশনের একটা বড় অনুষঙ্গ। এখন নামী দামী ফ্যাশন হাউজগুলোও রাখঢাক করে রঙিন প্যান্টালুনগুলো বিক্রি করলেও শুরুটা করেছিল নিউ মার্কেট কিংবা হকার্স মার্কেটের সার্বজনীন ক্রেতাগণ। যে-কোনো স্ট্রিট ফ্যাশনের এটাই সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, নামের সাথে মিল রেখেই শহরের অলিতে গলিতে পথ পেরিয়ে যেন হঠাৎ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এই ফ্যাশন অধিকাংশ ক্ষেত্রে যার মূল গ্রাহক তরুণরা। দু'চারজনের স্ট্রিট ফ্যাশন থেকে পরবর্তীতে অনেক তরুণই এটা সানন্দে গ্রহণ করেছে।

অবশ্য শুরুটাও বেশি দিনের নয়, গত বছর থেকে। যদিও ব্র্যান্ড শপগুলোর কল্যাণে রীতিমত হাল ফ্যাশনের একটা অংশ হয়ে উঠেছে এই রঙিন প্যান্টগুলো। রঙের আধিক্যের উপর ভিত্তি করে তারা দামও হাঁকছে সেই পরিমাণেই। সেই সাথে প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে 'রাউডি রাথর' জাতীয় হিন্দি মুভি কিংবা 'স্প্লিট্‌জ ভিলা' জাতীয় হিন্দি রিয়ালিটি শো'গুলো।

অনেকদিন ধরেই ছেলেদের প্যান্টের ক্ষেত্রে কালো কিংবা নীলচে জিন্স প্রাধান্য পেয়ে আসছিল। সঙ্গে হয়তো রুচি অনুযায়ী রঙচটা ভাব, আরেকটু সাম্প্রতিক হলে ছেঁড়াফাটা ডিজাইন। রঙিন প্যান্টের চল তুলনামূলক নতুন। কালো কিংবা নীল জিন্সের সাথে কমবেশি যে-কোনো রঙের শার্ট বা টি-শার্ট গায়ে চড়িয়ে নেয়া যায়। কিন্তু রঙিন প্যান্ট পরার ক্ষেত্রে টি-শার্ট বা শার্ট মিলিয়ে পরার ব্যাপারটা মাথায় রাখা জরুরি। যদি একটা কটকটে বিট রঙা লাল প্যান্টালুনের সাথে ততোধিক কটকটা কমলা টি-শার্ট পরা হয় সেটা চোখের জন্য বিশেষ সুখকর হবে না। তবে এই লাল প্যান্টটির সঙ্গেই চমৎকার মানিয়ে যেতে পারে কোনো সুপারহিরোর কার্টুন সম্বলিত সাদা টি-শার্ট। তাই রঙ [illegible] সং সাজতে না চাইলে 'ম্যাচিং'-এর

Scanned with MOBILE SCANNER

ব্যাপারটা জরুরি। মনে রাখবেন, আপনি যে পোশাকটিই পরবেন না কেন তা যেন আপনার ব্যক্তিত্ব বজায় রাখে, সেই সাথে আপনাকে অন্যদের কাছে আকর্ষণীয়ও করে তোলে।

রঙিন প্যান্টালুন পরার মনঃস্তত্ত্বটা উপস্থাপন করা যেতে পারে এভাবে। একটা সময় দেহের উর্ধ্বাংশে নানা রঙের টি-শার্ট বা শার্টে তারুণ্য প্রকাশ করতো ছেলেরা। এখন সেটা উল্টে গেছে, শরীরের নিম্নাংশে রঙের উপস্থিতিতেই তারুণ্য প্রকাশিত হচ্ছে। সেই সাথে তুলনামূলক সাদামাটা টি-শার্ট। তাই সময়ের সাথে রঙিন প্যান্টালুন পরিধানের গণ্ডি শুধু মেয়েদের মাঝেই সীমাবদ্ধ নেই। হালকা কিংবা গাঢ় যে-কোনো রঙ বেছে নিচ্ছে ছেলেরাও। রঙের বৈচিত্র্যও রকমারি। খসখসে বাদামী হলুদ, শরত আকাশের মতো নীল, ইট রঙা লাল, ঘাস রঙা সবুজ কিংবা গাঢ় মেরুন।

জনপ্রিয়তা যেমন বাড়ছে তেমনি বিপরীত দিকে অনেকের কাছে কুখ্যাতিই লাভ করছে এই হাল ফ্যাশন। একটু ভিন্ন কিছুকে গ্রহণ করা আমাদের সমাজের পক্ষে একটু কষ্টকর, বিশেষত যা চোখে পড়ার মত। কিছু তরুণ সানন্দে গ্রহণ করে নিচ্ছে যা চলছে তাই, আবার কেউ কেউ নাকও সিটকাচ্ছে। কারো মতে জঘন্য ফ্যাশন। কারো মতে নিছক মনোযোগ কাড়বার উদ্ভট উপায়।

হাল ফ্যাশন মনোযোগ কাড়বার উপাত্ত এতে দ্বিমত পোষণ করবার কিছু নেই। ফ্যাশন মানেই নিজেকে অন্যদের চাইতে একটু ভিন্নভাবে উপস্থাপন করবার প্রচেষ্টা। সাহসী কেউ একজন নিজেকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করলে কিছুটা কটু কথা শুনতে হয়। তবে অতীত যে-কোনো ক্ষেত্রেই দেখা গেছে তার পথ অনেকেই অনুসরণ করেছে, এমনকি কটাক্ষকারীদের অনেকেও ওই ফ্যাশন আপন করে নিতে দ্বিধা করেনি। ভিন্নতাই তখন সাধারণে রূপ নেয়। তবে সব কটাক্ষ উপেক্ষা করে কিন্তু রঙিন প্যান্টালুন পরা চালু রয়েছে। প্যান্টগুলোর চাহিদা সবচেয়ে বেশি আঠারো থেকে চব্বিশ-এর ছেলেদের মাঝে। যদিও হাল ফ্যাশনের সাথে যারা মানিয়ে চলেন তাদের জন্য বয়সটা ব্যাপার নয়। মূলত ট্রেন্ডের সাথে তাল মিলিয়ে চলবার জন্য অনেকেই বেছে নিচ্ছেন এই প্যান্টগুলো, কি আঠারো আর কি চব্বিশ! তাছাড়া 'ক্যাজুয়াল' ভাব ফুটিয়ে তুলবার জন্য এগুলোর জুড়ি নেই। তবে কারণ যাই হোক না কেন, স্ট্রিট ফ্যাশনের এই ধারা এখন অবস্থান করছে বেশ উঁচুতে। গেল ঈদে জিন্স/গ্যাভাডিন নির্বিশেষে রঙিন প্যান্টালুনের চাহিদা তাই বলে।

একটা ট্রেন্ডের শুরু যেমন আছে তেমনি শেষও আছে। একটা সময় বেশ ঢোলা জিন্স পরবার ঢল নেমেছিল। কাল প্রবাহে সেইসব জিন্স আর দেখা যায় না। কালো জিন্সই হোক আর রঙিন প্যান্টালুনই হোক, একটু আঁটসাঁট না হলে এখন পোশাকটা যেন সম্পূর্ণ হয় না। রঙিন প্যান্টের চাহিদা এখন তুঙ্গে, তাই বলা যায় খুব দ্রুত এই ফ্যাশনের শেষ হচ্ছে না। তবে স্ট্রিট ফ্যাশনের মারপ্যাঁচ এখানেও। হয়তো নতুন কোনো ট্রেন্ড কালই চালু হতে পারে এবং সেটার তোড়ে হারিয়ে যেতে পারে আজকের পথ মাতানো রঙিন প্যান্টালুনগুলো। তবে আজকের সাথে মানিয়ে চলতে হলে আজকের পথে যা দেখা যাচ্ছে তা পরিধান করবার বিকল্প নেই, অন্তত নিজেকে ট্রেন্ডের ভেতরে রাখতে চাইলে। তাই ফ্যাশন সচেতন হয়ে থাকলে এবং আপনার রুচির সাথে মিলিয়ে যদি কোনো রঙিন প্যান্টালুন ইতিমধ্যে পছন্দ হয়ে থাকে তবে এখনই সংগ্রহ করুন। ■

জনপ্রিয়তা যেমন বাড়ছে তেমনি বিপরীত দিকে অনেকের কাছে কুখ্যাতিই লাভ করছে এই হাল ফ্যাশন। একটু ভিন্ন কিছুকে গ্রহণ করা আমাদের সমাজের পক্ষে একটু কষ্টকর, বিশেষত যা চোখে পড়ার মত। কিছু তরুণ সানন্দে গ্রহণ করে নিচ্ছে যা চলছে তাই, আবার কেউ কেউ নাকও সিটকাচ্ছে। কারো মতে জঘন্য ফ্যাশন। কারো মতে নিছক মনোযোগ কাড়বার উদ্ভট উপায়।

Scanned with MOBILE SCANNER

গন্তব্য সিলোম

Soi 4

খুব ভোরের লালচে আলো চোখে এলোপাতাড়ি বাড়ি মেরে যাচ্ছে কিন্তু চিরচেনা সেই আজানের শব্দ কিংবা আঁধার তাড়ানো পাখির পাঁচমেশালি কিচিরমিচির শুনতে পাচ্ছি না। তারবদলে ইঞ্জিনের শোঁশোঁ একটা শব্দ কিছুক্ষণের মধ্যে মস্তিষ্কের নিউরনে নিউরনে খবর পৌছে দিল যে আমি মাটি থেকে প্রায় তিন হাজার ফিট উপরে ভোরের সোনালী আলো পড়া মেঘ কেটে কেটে এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে উড়ে যাচ্ছি। যাচ্ছি থাইল্যান্ড, এই প্রথম, হয়তো এই শেষ। মনের মধ্যে নানান মধ্যবিত্ত কামাচার হুটোপুটি খাচ্ছে। ঢাকা ছাড়ার আগে কত রকমারি উপদেশ আর লোভনীয় সব ঠিকানায় পকেট ভরে নিয়েছি, সুবর্ণভূমি এয়ারপোর্ট থেকে অল্প সময়ের আকাশ দূরত্বে বসে ভোরের প্রথম আলোয় এসব কথাই ভাবছিলাম।

প্লেন সুবর্ণভূমিতে 'ল্যান্ড' করবার আগে কিছু প্রশ্নের জবাব দিয়ে নিই। কখন বেড়াতে যাবেন থাইদের দেশে? অক্টোবরের শেষ থেকে এপ্রিলের পুরোটাই আসলে থাইল্যান্ডের ট্যুরিস্ট মৌসুম, বর্ষা বাদলের ঝামেলা নেই তাই শান্তিতে ঘুরে বেড়াতে সমস্যা হবে না। তবে পাক্কা ট্যুরিস্ট মৌসুমে হোটেলের দাম থেকে শুরু করে 'স্ট্রিট ফুড', সবকিছুর দামেই কিন্তু চাঙ্গা ভাব বিরাজমান। নির্ভেজাল ভ্রমণের উদ্দেশ্যে থাইল্যান্ড গেলে ট্যুরিস্ট মৌসুমকে নিশানা করে এগোনোই ভালো। তবে উদ্দেশ্য যদি হয় উরুদেশে গুরুদন্ড, কোনসময়ই নয় মন্দ! ক্লাবিং, পার্টিং, খাওয়া বা যৌনাচার, এযাবতীয় যেকোনো কাজের জন্য উরুদেশ তথা থাইল্যান্ড আমাদের মতো রূপবানদের গুরুদন্ডের হাতছানি দিচ্ছে বহুদিন ধরে।

থাইল্যান্ডের মূল রাস্তাগুলোর 'সাইড

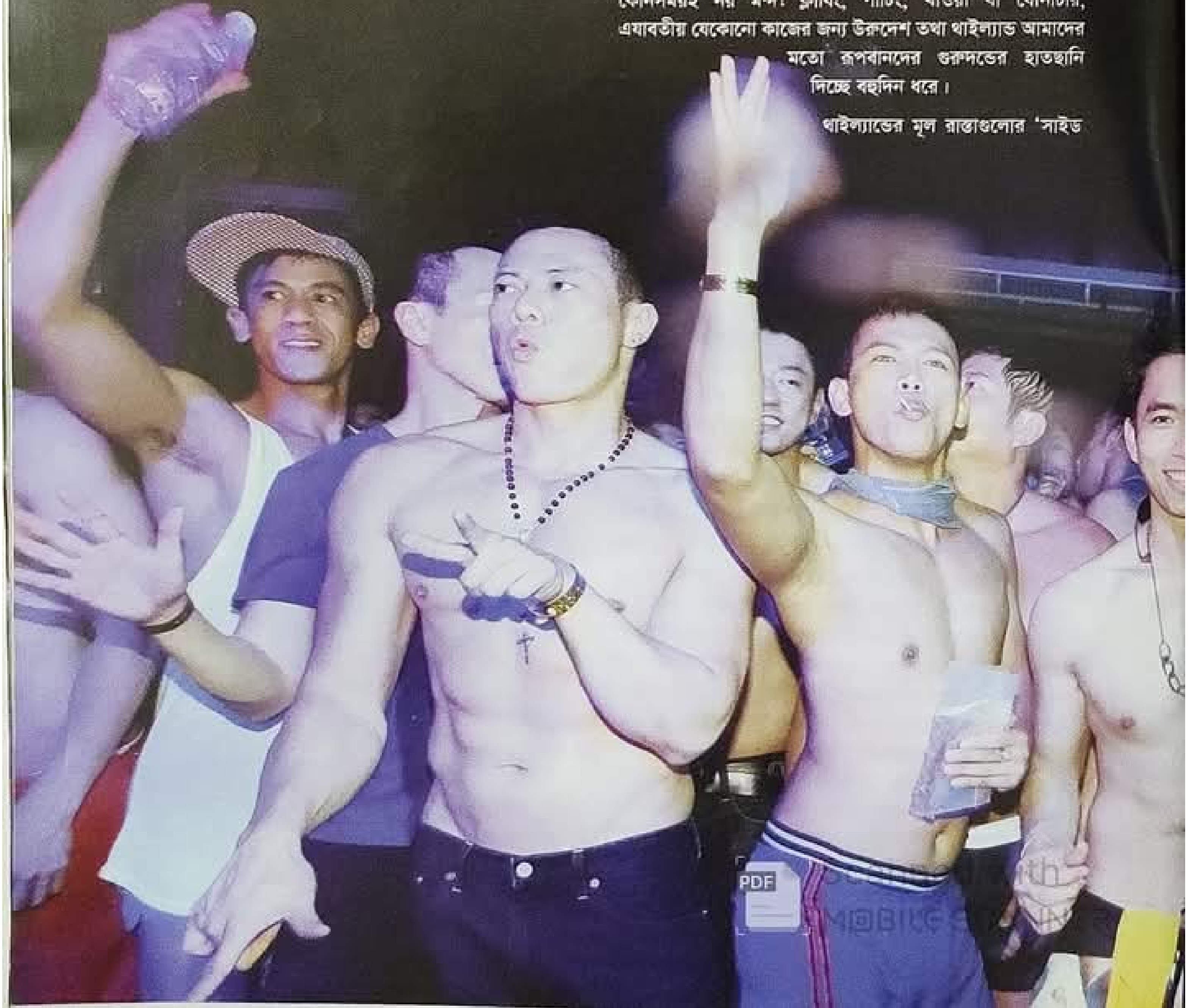

স্ট্রিট ব্রাউজিং' কে বলা হয় সয়। আমার আজকের এই লেখা সিলোমের সেইরকম এক রাস্তার চার নম্বর গলিতে ঘোরাফেরা করবে। আমার মতো আজন্ম বাংলাদেশে বেড়ে ওঠা ছেলের জন্য সেই রূপবানদের ভিড়ে হারিয়ে যাবার প্রথম উন্মুক্ত অভিজ্ঞতা অবশ্যই অনেক বিচিত্র। আপনিও যদি সেই তীরেই তরী ভেড়াতে চান তবে চেষ্টা করুন সিলোমে থাকতে এবং যতোটা সম্ভব সয় 4 এর কাছাকাছি থাকতে। হোটেল খোঁজার ভার agoda.com -এর উপর অনেকটা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। এখানে এলাকাভিত্তিক নানা হোটেলের হিসেব নিকেশ পেয়ে যাবেন। নিজের ইন্টারন্যাশনাল ক্রেডিট কার্ড না থাকলে এমন কাউকে হাত করুন যার কাছ থেকে সেই সুবিধা আদায় করতে পারবেন! আর যদি সেরকম কিছু সম্ভব না হয়, সোজা সয় 4-এর আশেপাশে ব্যাগপত্র নিয়ে ঢুঁ মারতে থাকলে কিছু না কিছু পেয়েই যাবেন।

এবার ফিরে যাই এয়ারপোর্টে। প্লেন থেকে নেমেই একবুক দম নিয়ে স্রোতের সাথে দৌড় লাগালাম, সবাই ছুটছে ইমিগ্রেশন অফিসের দিকে। ইমিগ্রেশনের লম্বা লাইনের জ্যাম পেরিয়ে এয়ারপোর্টের বাইরে গিয়ে দেখি হাতের ডান পাশে ট্যাক্সি কাউন্টার। কোথায় যাবো কাউন্টার অপারেটরকে জানালে ওরাই ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে দেয়। এজন্য ওদেরকে আলাদা টাকা গুণতে হয় না, ট্যাক্সির ভাড়া যা আসবে তাই। তবে এক্ষেত্রে ট্যাক্সিওয়ালাকে এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে যেতে বলতে ভুলবেন না যেন। মনে রাখবেন টাকা কিছু বেশি গেলেও নিচের রাস্তা দিয়ে ব্যাংককের দুঃসহ ট্রাফিক ঠেলে যাবার চাইতে উপর দিয়ে যাওয়াই বেশি ভালো, তাতেও নিদেনপক্ষে চল্লিশ মিনিট তো লাগবেই! সিলোমের কাছে একটা হোটেলে ব্যাগ পত্র রেখেই বেরিয়ে পড়লাম 'সেভেন ইলেভেনে'র খোঁজে। ঢাকার ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা এটিএম বুথের মতোই ওদের এই সুপার শপে আপনি পানি, প্যারাসিটামল, সিম কার্ড থেকে শুরু করে কনডম কিংবা 'লুব'ও খুঁজে পাবেন অনায়াসেই। এক্ষেত্রে একটু কানকথা বলে রাখি, দশ থেকে পাঁচ টাকা দিয়ে বেশ কয়েক প্যাকেট ফেসিয়াল টিস্যু কিনে ফেলুন। ব্যাংককে বেশিরভাগ পাবলিক টয়লেটে পানি নেই, অনেক ক্ষেত্রে টাকা দিয়ে টিস্যু কিনতে হয়। আমি ভুক্তভোগী, তাই বলছি! আর সিম কিনলে ওদেরকে দিয়েই সেটা চালু করিয়ে নেয়া ভালো নইলে সবকিছু থাই ভাষায় হবার কারণে খাবি খাবার সম্ভাবনাই বেশি!

আবাসন হয়, সিম কেনাও শেষ, এবার তবে বেরিয়ে পড়ি সুখ নৈশের আড্ডায়। বিচিত্ররকম মানুষের ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের স্ফূর্তির প্রকাশে তারা নানা স্থানে বার খুঁজে বেড়ায়। আমার রূপবানকেন্দ্রিক মন তাই সন্ধ্যাবেলায় সয় 4-এর আশেপাশেই বার সন্ধানে ব্যস্ত তখন।

সেদিনের সন্ধ্যাটা আজন্ম ঢাকায় বেড়ে ওঠা আমার জন্য একেবারেই অন্যরকম নতুন ছিল। দু-একবার রমনার সান্ধ্য আলো-আঁধারের গলিতে গলিতে কিছু সন্ধানী কামাতুর চোখের এলোপাতাড়ি সন্ধান তো আগেও দেখেছি। কিন্তু রমনার বকুলতলার সাথে সিলোমের এই উপলব্ধিকে কিছুতেই মেলানো যায় না। ওখানে আলোর চেয়ে অন্ধকারের দাপট বেশি, সয় 4 একেবারে যেন তার উল্টো। এখানে সন্ধ্যার উজ্জ্বল বাহারি সব নিয়ন আলো আর আনন্দ মানুষকে যেন তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এখানেও মানুষের সাথে মানুষের চোখাচোখি হয়, কিন্তু সেই চাহনীর পেছনে নিষিদ্ধ যৌনাচারের পাপবোধ বয়ে আনে না। এখানে বার, পাব আর দোকানের চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলোর সবকিছুই দিনের মতোই স্পষ্ট, স্বচ্ছ এবং স্বাধীন। নিষিদ্ধ কামাচারের

উগ্র গন্ধের চাইতে নিজের যৌন চাহিদাকে স্বীকৃতি দেবার আনন্দ চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

তত্ত্বকথা ছেড়ে কিছু তথ্য দেয়া যাক এবার। আপনারাও যারা আমার মতো প্রথমবার যাচ্ছেন, তাদের মতো রূপবানদের জন্যই এসব তথ্য। বিশ্ববিখ্যাত দুটি বার, 'টেলিফোন বার' এবং 'ব্যালকোনি' একেবারেই মুখোমুখি অবস্থান করছে এখানে। সয় 4-এর আকাশে বাতাসে এই দুটো বার যেন মুক্তির আল্পনা এঁকে দিয়েছে। রাত নয়টা থেকে আসর জমতে শুরু করে, থাকতে পারবেন বারোটা পর্যন্ত। রাতের খাবারের প্ল্যানটাও এখানে করে নিতে পারেন। এই দুটি বার ছাড়াও একই রাস্তায় 'বিয়ার লাভার এন্ড চাবি চেসার'দের জন্য আছে 'বিয়ারবি বার'। আপনি যদি নাদুস নুদুস লোমশ 'মাচো' পুরুষের সন্ধানে থেকে থাকেন তবে এই বারটি হতে পারে আপনার আদর্শ গন্তব্যস্থল যেখানে এক থেকে দু-ঘন্টা অনায়াসেই কাটাতে পারবেন আপনি।

এবার চলুন সয় 4-এর আশেপাশে ব্যাংককের এমন আরো কিছু জায়গার খোঁজ দেই আপনাদের।

ডিজে স্টেশনঃ ব্যাংকক যাবেন আর ডিজে স্টেশনে পার্টি করবেন না, এটা অনেকটা অপরাধের পর্যায়ে পড়ে! কেন সেটা নিজেই গিয়ে আবিষ্কার করুন। বেশি আগে গিয়ে লাভ নেই, রাত এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার আশেপাশের সময়টায় গেলে দেখবেন পার্টি জমতে শুরু করেছে। সয় 4 থেকে বেরিয়ে বামে হাঁটা ধরলে পাবেন সয় 2, এখানেই 'ডিজে স্টেশনে'র অবস্থান। যাবার সময় সাথে অবশ্যই আপনার পাসপোর্টের ফটোকপি সাথে রাখবেন, মনে রাখবেন বয়স বিশ এর নিচে হলে কোনো অবস্থাতেই আপনাকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না ওরা। দো'তলা এই 'ডান্স ক্লাবে'র মূল আকর্ষণ হলো 'ম্যাটিনি ড্র্যাগ শো' যেটা শুরু হয় রাত সাড়ে এগারোটায়। অদ্ভুত সুন্দর কোরিওগ্রাফি, সাজ-পোশাক আর অভিনয়ে ভরপুর এই শোটি একবার দেখলে অনেকদিন আপনার স্মৃতিতে দাগ কেটে থাকবে। শনি-রবিবার এখানে অকল্পনীয় ভীড়ের বহরে পা ফেলবার জায়গাটি পাওয়াও মুশকিল, তাই অন্যান্য সাপ্তাহিক দিনে যাবার চিন্তা করাই ভালো।

জুপিটার এবং তাওয়ান বারঃ ব্যাংকক 'গো-গো' বার এবং 'গো-গো' শো'তে ভরপুর, সবাই টানবে আপনাকে তাদের নিজেদের বারের দিকে, তবে আপনার হাতে যদি সময় একেবারেই কম থাকে আর আপনি উপভোগ করতে চান ব্যাংককের সেরা 'গো-গো' শো তবে 'জুপিটার ২০০২' বার আপনার প্রথম গন্তব্য হওয়া উচিত। ডিজে স্টেশন থেকে পায়ে হাঁটার দূরত্বেই পেয়ে যাবেন এর খোঁজ। আর যারা কিছুটা মেশি-পেশি ভক্ত, তাদের জন্য 'তাওয়ান' বার যেন স্বর্গ! বডিবিল্ডারে ভরপুর এই বারে আপনার পছন্দের পেশীমানবকে খুঁজে দেখতে পারেন অনায়াসেই।

জি ও ডী (গাইজ অন ডিসপ্লে) : রাত দুটো থেকে এই বার জমে উঠে নাচের তালে তালে আর চলে পুরোটা রাত।

সয় টয়ালাইটঃ সয় 4-এর কাছাকাছি একটা গলি হলো 'সয় টয়ালাইট'। 'কল-বয়' আর 'গো-গো বয়েজে' ভরা এই গলি দিয়ে হেঁটে যাবার অভিজ্ঞতাটা অন্যরকম। নানা বয়সী রূপবানে ভরা এই এলাকায় বসে একটা ড্রিংকও সেরে নিতে পারেন। আসলে যা খুশি তাই করতে পারেন, আমি বলার কে!

অনেক পার্টি হল, এবার নিজের দিকে একটু তাকান! কি চায় এই

শরীর? একটু আরাম? কষ্ট কষ্ট সুখ? রূপবানদের জন্য আলাদা করে বানানো 'ম্যাসাজ হাউজ' কিংবা 'সনা বাথ' আপনাকে দিতে পারে সেই সমস্যার সমাধান। সেরা জায়গাগুলির কথাই বলছি।

ব্যাবিলনঃ ব্যাংককে ভিনদেশীদের জন্য সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত 'সনা বাথ হাউজে'র অন্য নাম ব্যাবিলন। বাথ, রেস্টুরেন্ট, সুইমিংপুল থেকে শুরু করে সনা রুম, ডার্ক রুম, কি নেই এখানে! মাত্র ৩০০ বাথ পকেট থেকে গেলেও পাবেন অনন্য অমূল্য এক অভিজ্ঞতা। শনি আর রবিবার সবচেয়ে জমজমাট এই বাথ। বিকেল তিনটা থেকে জমতে শুরু করলেও রাত দশটায় কিন্তু বন্ধ হয়ে যায় সদর দরজা।

এডোনিস স্পাঃ আগেই বলে রাখি, এই জায়গার খরচাপাতি একটু বেশি। ম্যাসাজ ৬০০-৭০০ বাথের মধ্যে হয়ে গেলেও মর্দনকারীকে ১০০০ বাথের নিচে টিপ দেয়ার রেওয়াজ নেই। আপনি কি রকম ম্যাসাজ চান, কোনো বয়েসী আর কিরকম ছেলে চান, সব আগে থেকে স্পা ম্যানেজারকে বলে রাখুন। এক্ষেত্রে বঙ্গদেশীয় লজ্জা পরিহার করাই উত্তম। ঠিকানা জানতে গুগল-এর সাহায্য নিন।

এতো পার্টি, ফূর্তি আর ম্যাসাজের পর পেটের ক্ষিদের কথা ভাবার সময় হলো এবার। ব্যাংকক-এ গিয়ে খুঁজে খুঁজে ম্যাকডোনাল্ড বা কেএফসি'তে খাবার খাওয়াটা রীতিমত অপমানজনক। সিলোমের রাস্তাতেই আপনি বহু 'স্ট্রিট ফুডে'র দোকান পাবেন যাদের খাওয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং রীতিমত গোগ্রাসে গেলার মতো সুস্বাদু। তবে এক্ষেত্রে 'পর্ক ফ্যাট' এড়াতে চান যারা, খাবার বানানোর আগেই সেটা রন্ধনশিল্পীকে জানিয়ে দেয়াই ভালো। চলুন কিছু ভালো খাবারের দোকান ঘুরে আসি!

কফি সোসাইটিঃ সারারাতের পার্টি সেরে ক্লান্ত ঘুমের পর সকাল দশটায় উঠে কফি খেতে খেতে ব্যাংককের ব্যস্ত সকাল উপভোগের জন্য কফি সোসাইটি অনেকের প্রিয় স্থান। ওয়াই ফাই থাকায় ল্যাপি নিয়ে বসে দিনের কাজটাও এই ফাঁকে সেরে ফেলতে পারেন। দারুন মজাদার মেন্যু থেকে আপনার পছন্দের খাবার বেছে নিন। আমার পছন্দের আইটেম 'এগ বেনেডিক্ট'। পর্ক না খেতে চাইলে আগেই জানাতে হবে।

থাই ডিনারঃ রাতে ভালো খাবারের প্রচুর জায়গা রয়েছে ব্যাংককে। তবে প্রকৃত থাই রসনার স্বাদ নিতে চাইলে 'বোয়া' রেস্টুরেন্টে যাবার কথা সবাইকে বলবো আমি। ওদের 'কোকোনাট সী ফুডে'র কোনো জুড়ি নেই। আর যদি কেবল সী ফুড খাওয়াই উদ্দেশ্য হয় তবে সীলোমের রাস্তায় একটু ঘোরাফেরা করলেই 'তালা সীফুড রেস্টুরেন্ট' পেয়ে যাবেন আপনি। ঠিক সেই অর্থে রেস্টুরেন্ট নয় এটা, রাস্তার গলিতে চেয়ার টেবিল পেতে খাবারের আয়োজন। কিন্তু ওদের গাড়ি ভর্তি 'সী ফুডে'র বিপুল সমাহার দেখে লোভ সামলানো মুশকিল। যতো রকমের ওয়েস্টার, মাসল, কাকড়া কিংবা লবস্টার চান, সব পেয়ে যাবেন এখানে। দামটাও কিন্তু হাতের নাগালের মধ্যেই।

সীলোম কুকিং ক্লাসঃ থাই রান্না শিখতে শিখতে যদি খেতে চান, তবে হাত পাকাতে চলে আসতে পারেন এই আস্তানায়, পকেট থেকে মাত্র এক হাজার বাথ খসিয়ে। আপনার শিক্ষক হবেন হাসি খুশি একজন রূপবান, সকাল নয়টা থেকে তার ক্লাশ চালু। তিনি আপনাকে এক দঙ্গল ছাত্রের সাথে স্থানীয় কাঁচাবাজারে নিয়ে গিয়ে মাছ, মশলা, সব্জি সব চেনাবেন। এরপর আপনি সবার সাথে বাজার করবেন, মশলা বাটবেন, কাটবেন এবং সবশেষে পাঁচপদ রান্না করে খাবেন। এটা আসলেই অন্যরকম এক অনন্য অভিজ্ঞতা। আগে থেকেই বুকিং এবং পেমেন্ট করে রাখতে হবে।

আমরা পার্টি করলাম, গা টেপালাম, খেলাম-দেলাম, তো এবার বাড়ি ফিরবো কি খালি হাতে? ফিরলেই গিফ্‌ট-এর জন্যে ফেউ ধরবে যে সবাই! আর প্রথমবার গেলে তো কথাই নেই। এবার কিছু তেমন দোকানের কথা বলে নেই।

জিম থমসন সিল্ক শপঃ এই দোকানকে বলা চলে ব্যাংককের আড়ং, জিনিসের দাম খুব বেশি, তবে দেখে শুনে বুঝে কিনলে পেয়ে যেতে পারেন আপনার বাবা, ভাই, বোন কিংবা বয়ফ্রেন্ডের জন্য দারুন সিল্কের টাই অথবা মেয়েদের জন্য চমৎকার কিছু স্কার্ফ।

এমবিকে মলঃ সস্তায় বাজার সারার জন্য এর কোনো জুড়ি নেই। দেখে, বুঝে, দাম করে জিতে নিতে পারেন হাল ফ্যাশনের দারুন জুতো, ব্যাগ কিংবা ছেলেদের আন্ডারওয়্যার। এছাড়া ছোট ছোট গিফ্‌টের নানারকম দোকান পেয়ে যাবেন ব্যাংককের অলিতে গলিতে।

একদম শেষটায় এসে কিছু দরকারী তথ্য দেই। প্রথমেই আসে ভিসা প্রসঙ্গ। ভিসার জন্য অন্তত সপ্তাহ তিনেক হাতে রেখে আবেদন করুন। আবেদন করবার একমাস আগে থেকে ব্যাংকে অন্তত ষাট হাজার টাকা জমা রাখুন। ব্যাংক স্টেটমেন্টের কাগজ দরকারী, তাই সেটা যতো হৃষ্টপুষ্ট হয় ততোই ভালো। সব ট্রাভেল এজেন্টরাই ভিসা করতে পারে, তাই নিজে সব ঝামেলা করতে না চাইলে ট্রাভেল এজেন্টের ঘাড়ে কিছু বোঝা চাপিয়ে দিতে পারেন। উপরের এই সমস্ত জায়গাগুলোতে ঢুঁ মারবার জন্য পাঁচ রাত ব্যাংককে কাটানোই যথেষ্ট। থাকা খাওয়া সব বাবদ সত্তর হাজার টাকার মতো লাগলেও পুরো প্ল্যানটা আসলে চল্লিশ হাজারেও সেরে ফেলা যায়। সবশেষে বলতে হয় যে ব্যাংকক যাবেন খোলা আর উদার মন নিয়ে। ব্যাংকক-এর ছোট ছোট রাস্তার অলিতে গলিতে রূপবানদের মুক্তির যে স্বাদ পাওয়া যায়, কোনো টাকা দিয়ে তার পরিমাপ চলে না, সে চেষ্টাও করবেন না! আলিঙ্গনেই মুক্তি, তাই আলিঙ্গন করুন ভিন্ন জগতের বিখ্যাত এই শহরকে! ■

ব্যাংককে ভিনদেশীদের জন্য সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত 'সনা বাথ হাউজে'র অন্য নাম ব্যাবিলন। বাথ, রেস্টুরেন্ট, সুইমিংপুল থেকে শুরু করে সনা রুম, ডার্ক রুম, কি নেই এখানে! মাত্র ৩০০ বাথ পকেট থেকে গেলেও পাবেন অনন্য অমূল্য এক অভিজ্ঞতা। শনি আর রবিবার সবচেয়ে জমজমাট এই বাথ। বিকেল তিনটা থেকে জমতে শুরু করলেও রাত দশটায় কিন্তু বন্ধ হয়ে যায় সদর দরজা।

Scanned with MOBILE SCANNER

হলিউডে সমপ্রেম

ডিভিডি বা ফিল্ম সংগ্রহের বাতিক আমার বেশ অনেকদিনের। বন্ধুরা বাসায় আসলে তাদের জোর করে ফিল্ম দেখানোর বাজে প্রবণতাও আজ অনেকদিন হলো ভালো রপ্ত করে নিয়েছি। এসব সিনেমার মধ্যে বলা বাহুল্য অনেক সময়েই সমপ্রেম প্রসঙ্গ চলে আসে। ভার্সিটির বন্ধুরা সেসব সিনেমা বেশ বিরস বদনে দেখলেও এই ব্যাপারে আগ্রহ আছে যাদের, তারা যেন একটু নড়ে চড়েই দেখতে বসে এবং শেষতক হতাশ হয়। গাইগুঁই করে অনেকেই বলে ফেলে 'ব্রোকব্যাকে'র মতো কোনো ছবি নেই? আমার মুখ শুকিয়ে যায়! একেবারেই সমপ্রেমীদের উপজীব্য করে বানানো সিনেমার সংখ্যা এমনিতেই বেশ কম। হয়তো কিছুটা ধূম্রজাল, কিছুটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত-এই। তাই বিস্তৃতভাবে কেবল

Scanned with MOBILE SCANNER

আমাদের নিয়েই বানানো ছবি আমার সংগ্রহে খুব একটা নেই। আমরা তো সকল শতাব্দীতেই ছিলাম, কিন্তু আমাদের অস্তিত্ব আর ভিন্নতাকে সংস্কৃতির অন্যান্য শাখাগুলোর মতো চলচ্চিত্রেও উপেক্ষা করা হয়েছে, কখনো সেটা অপমানে পর্যন্ত গিয়ে গড়িয়েছে। আমাদের উপস্থিতি সকল যুগের চলচ্চিত্রেই ছিল-কিন্তু প্রাপ্য সম্মান আর সংবেদনশীলতার সাথে নয়। এসবের অনুসন্ধানেই আজকের এই লেখা।

চলচ্চিত্রে সমপ্রেমের ব্যাপারটা প্রথম উঠে আসে একেবারে উনবিংশ শতকের শেষের দিকে। ১৮৯৫ সালে উইলিয়াম ডিকসনের 'দি ডিক্সন এক্সপেরিমেন্টাল সাউন্ড' চলচ্চিত্রটি এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। হলিউড সিনেমার গৎবাঁধা নিয়মের বাইরে এসে এই সিনেমাতেই প্রথম দুজন পুরুষকে সাবলীলভাবে একে অন্যের বাহুলগ্ন হয়ে নাচতে দেখা যায়। এই চলচ্চিত্রটির সবচেয়ে মজার দিক বোধহয় এটাই যে, এখন সিনেমাটি আর তার আসল নামের দ্বারা পরিচিত নয়, বরং পুরো বিশ্বে এই সিনেমাটি এখন 'দি গে ব্রাদার' সিনেমা হিসেবে অধিক পরিচিত। তবে এই অস্পষ্ট সূচনার পর পরবর্তী অনেক সিনেমাতেই সমপ্রেমকে 'সাবটেক্সট' হিসেবে ব্যবহার শুরু হয়। এইসবের মধ্যে 'লে একলিপ্স দু সোলেই এন পেইনে লুনে (১৯০৭, ফ্রান্স)', 'দি উইংস (১৯১৬, সুইডেন)', 'ডিফারেন্ট ফ্রম আদরস (১৯১৯, জার্মানী)' উল্লেখযোগ্য। সুইডিশ সিনেমা 'দি উইংস'-এ ইতিহাসে সর্বপ্রথম পর্দায় এক পুরুষের সাথে অন্য পুরুষের চুম্বন দৃশ্য দেখানো হয়। ১৯১৫ সালে চার্লি চ্যাপলিনের বিখ্যাত 'এ উমেন' সিনেমায় চ্যাপলিন যেমন মেয়ে সাজেন তেমনি 'সিলভিয়া স্কার্লেট' সিনেমায় ক্যাথরিন হেপবার্ন প্রথম পুরুষ সেজে হয়তো চিরায়ত লিঙ্গ প্রথা ভাঙনের সূত্রপাত ঘটান হলিউডে।

১৯২০-১৯৩০ সাল পর্যন্ত হলিউডে রাজত্ব শুরু করে নতুন এক তত্ত্ব, যার নাম ছিল 'প্যান্সি'। এই সময়ে নির্মিত সিনেমাগুলোতে সমকামী চরিত্রগুলোকে কেবল কমেডি উপাদান হিসেবেই রাখা হত। নির্বাক থেকে সবাক যুগে প্রবেশের সাথে সাথে এই 'প্যান্সি' তত্ত্ব আরো প্রসার পায়। এই চরিত্রগুলির আলাদা কোনো বিনির্মাণ বা শক্ত গঠন ছিল না। এরপরের হলিউড ইতিহাসটা আরো ভয়ংকর। ১৯২০-এর শেষের দিকে আমেরিকাতে 'মোশন পিকচার প্রোডাকশন কোড' বা 'হে'স কোড' চালু হয় যাকে বলা চলে সমপ্রেম নিয়ে চলচ্চিত্র ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকার যুগ। এই 'হে'স কোডে'র কাজ ছিল অনেকটা সেন্সর বোর্ডের মতো, সিনেমার আপত্তিজনক অংশ কর্তন করে সিনেমা মুক্তি দেয়া। 'হে'স কোড' বলা চলে 'প্যান্সি'-দের পুরোপুরি বর্জন করা শুরু করে। এই সময়টায় চলচ্চিত্রে সমপ্রেম কেবল পরোক্ষভাবে দেখানো যেত, একটু সরাসরি ইঙ্গিত থাকলেই সেই ছবি আর মুক্তি পেত না। ১৯৫১ সালে টেনেসি উইলিয়ামে'র নাটক অবলম্বনে নির্মিত সিনেমা 'এ স্ট্রিটকার নেম ডিজায়ার' এ 'ব্লাঞ্চ ডুবোয়েস' নামক নারী চরিত্রটির স্বামী স্পষ্টতই একজন সমকামী হওয়া সত্ত্বেও 'হে'স কোডে'র কবলে পড়ে শেষ পর্যন্ত সিনেমার এই ব্যাপারটিকে এডিট করে ফেলে দেয়া হয়।

মজার ব্যাপার হলো চলচ্চিত্রের এই পীঠস্থানে সমপ্রেম নিয়ে সিনেমা যখন একেবারেই নিষিদ্ধ, তখন পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশ এগিয়ে গেছে অনেক আগে। কেবল সমপ্রেমকে উপজীব্য করে একের পর এক সিনেমা তৈরি হচ্ছে তখন ইউরোপীয় নানা দেশে। জার্মানির 'ম্যাডচেইন ইন ইউনিফর্ম (১৯৩১)' এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

হলিউডের আরেক কিংবদন্তীর কাছে যাওয়া যাক, আলফ্রেড হিচকক। তার বেশ কিছু চলচ্চিত্রে তিনি সমকামী চরিত্র ব্যবহার করেছেন। মজার ব্যাপার হলো ব্যবহৃত সবকটি চরিত্রই খল এবং তুমুল জনপ্রিয়। 'রেবেকা'র মিসেস ডেনভার কিংবা 'স্ট্রেঞ্জার অন এ ট্রেইন'র ব্রুনো এন্থেনি অথবা 'রোপ'র ব্রান্ডন, এই সবকটি খল চরিত্রই সমকামী এবং একই সাথে তুমুল জনপ্রিয়।

১৯৬১ সালে সম্পূর্ণ সমপ্রেমকে উপজীব্য করে যুক্তরাজ্যে 'ভিকটিম' ছবিটি তৈরি হয়। জেমস মেসন, জ্যাক হকিন্স কিংবা স্টুয়ার্ট গ্রেঞ্জারের মতো প্রতিষ্ঠিত অভিনেতারা ফিরিয়ে দেবার পর অবশেষে ডার্ক বোগার্ড এতে অভিনয়ে রাজি হন। এই সিনেমাটিতেই সর্বপ্রথম বিশ্ব চলচ্চিত্র ইতিহাসে 'হোমোসেক্সুয়াল' শব্দটি ব্যবহার হয় এবং অনস্বীকার্যভাবে মুক্তির সাথে সাথেই নিষিদ্ধের খাতায় নাম লেখায়। এই সিনেমাটিতেই বিশ্ব ইতিহাসে সর্বপ্রথম সমপ্রেম এবং এর আবেগকে সংবেদনশীলতার সাথে ফুটিয়ে তোলা হয়, তাই ইতিহাসে এই চলচ্চিত্রের মূল্য অনেক।

৬০-এর দশক থেকে হলিউডে সমপ্রেমকে আরো সাবলীলভাবে চিত্রায়ন শুরু হয় যার মূলে ছিল 'হে'স কোডে'র বিলুপ্তি এবং রেটিং ব্যবস্থার উৎপত্তি। ১৯৬৫তে মুক্তি পায় 'ইনসাইড ডেইজি ক্লোভার' যেখানে একজন সমপ্রেমীর চরিত্র স্পষ্টভাবেই চিত্রায়িত হয়। 'ভিকটিম'-এর মতো এই সিনেমাটিকে নিষিদ্ধের খাতায় নাম লেখাতে হয়নি। এছাড়াও এন্ডি ওয়ারহল, কেনেথ অ্যাঙ্গার প্রমুখ নির্মাতারা এই সময় স্বল্প বাজেটে সমপ্রেম নিয়ে বেশ কিছু 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট' সিনেমা নির্মাণ করেন। ৭০-এর দশকে নির্মিত হয় 'বয়েজ ইন দ্যা ব্যান্ড' যার পুরোটা জুড়েই আছে সমপ্রেম। একই দশকে আরো মুক্তি পায় 'সামথিং ফর এভরিওয়ান (১৯৭০)', 'সানডে ব্লাডি সানডে (১৯৭০)' এবং বিখ্যাত 'ক্যাবারেট (১৯৭২)'। ৮০-এর দশকে এইডস মহামারীরূপে পুরো বিশ্বে

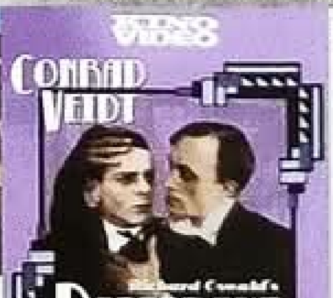

Scanned with
MOBILE SCANNER

একবিংশ শতকে এসে
হলিউড সমপ্রেমকে একেবারেই
আপন করে নেয়। সামাজিক
গ্রহণযোগ্যতা আর নানারকম
আন্দোলনের সাথে চলচ্চিত্রে
সমপ্রেমীদের চরিত্র চিত্রায়ন এসময়
আরো অনেক সংবেদনশীল এবং
বৈচিত্রময় হতে শুরু করে।

ছড়িয়ে পড়লে এই সম্পর্কে সচেতনতামূলক সিনেমা তৈরি হয় বেশ কিছু। 'লং টাইম কম্পানিয়ান' কিংবা 'ফিলাডেলফিয়া' এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। 'ফিলাডেলফিয়া'তে এইডস আক্রান্ত সমকামী চরিত্র করে টম হ্যাংকস সে বছর অস্কারটাও বাগিয়ে নেন। এই সময়ে আরো মুক্তি পায় 'মরিস (১৯৮৭)', 'মাই ওন প্রাইভেট আইডাহো (১৯৯১)', 'অল এবাউট মাই মাদার (১৯৯৯)' 'বয়েজ ডোন্ট ক্রাই (১৯৯৯)' ইত্যাদি।

একবিংশ শতকে এসে হলিউড সমপ্রেমকে একেবারেই আপন করে নেয়। সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা আর নানারকম আন্দোলনের সাথে চলচ্চিত্রে সমপ্রেমীদের চরিত্র চিত্রায়ন এসময় আরো অনেক সংবেদনশীল এবং বৈচিত্রময় হতে শুরু করে। 'ব্যাড এ্যাডুকেশন (২০০১)', 'কিনসে (২০০৪)', 'মিস্টেরিয়াস স্কিন (২০০৪)', 'দি আওয়ারস (২০০৪)' 'আন্ডার দি তুস্কান সান (২০০৩)', 'বিফোর নাইট ফল (২০০০)' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

২০০৫ সালে দুই পুরুষের ভালোবাসাকে উপজীব্য করে তৈরি সিনেমা 'ব্রোকব্যাক মাউন্টেইন' মুক্তির পর পুরো বিশ্ব যেন নড়েচড়ে বসে। পুরো বিশ্বে এমন সমপ্রেমী পাওয়া দুষ্কর যে কিনা এই সৃষ্টির নাম শোনেনি। মুক্তির পরপরই ব্যাপক আলোচনা আর সমালোচনার ঝড় তোলে ছবিটি। অস্কার দৌড়ে অনেকটা এগিয়ে থাকার পরেও এর বিরোধীপক্ষ সিনেমাটি নিয়ে জোর অপপ্রচার চালায়। আর্নেস্ট বর্গিং-এর মতো অস্কারজয়ী অভিনেতাও প্রচারণা চালায় যাতে ছবিটি অস্কার না পায়। দুঃখজনকভাবে ছবিটি সেরা ছবির পুরস্কার না পেলেও জিতে নেয় সেরা পরিচালকের অস্কারটি।

এরপর থেকে হলিউডে এই বিষয়কে উপজীব্য করে সিনেমা তৈরির অনেকটা হিড়িক পড়ে যায় যেন। বিংশ শতকের 'প্যান্সি', চল্লিশের 'ভিলেইন' কিংবা ষাটের 'সিসি' নয়, আজ কেবল রূপবানদের প্রেম, কাম আর চাহিদার মনস্তাত্ত্বিক নানা বিশ্লেষণ নিয়ে একের পর এক সিনেমা হচ্ছে, এমনকি আলাদা করে চলচ্চিত্র উৎসব পর্যন্ত হচ্ছে। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে হলিউডের চলচ্চিত্রে আমাদের অবস্থান এখন অত্যন্ত সুদৃঢ়ই বলা চলে। শুরুটা খুব বেশি আশাব্যঞ্জক না হলেও দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আজ হলিউডের চলচ্চিত্র সমপ্রেমকে সাধারণ এবং স্বাভাবিকভাবেই মূল্যায়ন করে। সমপ্রেমীদের প্রেম, দুঃখ, স্বপ্ন, প্রাপ্তি, আনন্দ-উদযাপন এসবকিছুই সেলুলয়েডে বন্দি হচ্ছে কোনোরকম বাধা ছাড়াই। কেবল সিনেমা আর তার শিল্পমান নয়, অন্যদের বোঝাতে কিংবা সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার শক্ত ভীত তৈরি করতে এসব চলচ্চিত্রে সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। আমাদের দেশেও একদিন হতাশার অন্ধকার কেটে সমপ্রেমীদের নিয়ে সিনেমা বানাতে এগিয়ে আসবে কেউ, সেরকম কিছু আশা করাটা কি বাস্তবতার [illegible]ন হবে? ■

Scanned with MOBILE SCANNER

আন্ডারটো

পেরুর একদম উত্তরে ছোট্ট উপকূলীয় মৎস্যজীবি এক দ্বীপের গল্প বলছি, সাগরের উত্তাল ঢেউ যেখানে তাদের বিধাতা, পুরো দ্বীপটাই তাদের একক শরীর আর তাদের সংস্কার, অপসংস্কার, আত্মীয়তার বন্ধন সবটাই সেই শরীরের অংশ-উপাংশ।

দ্বীপের বেশিরভাগ বাসিন্দাই ঈশ্বরেভীত, মৃত মানুষকে উপযুক্ত নিয়ম মেনে সাগরে ভাসিয়ে দেয়াটাই দ্বীপের মৃত মানুষ সৎকারের অন্যতম ধর্মীয় উপায়। ঈশ্বরের সাথে তাই ভালো যোগাযোগ রক্ষাকারী যে কারোরই দ্বীপে রয়েছে বিশেষ সম্মান। সিনেমার প্রধান চরিত্র মিগুয়েলা সেই আচারনিষ্ঠদেরই একজন। তাই প্রথা অনুযায়ী মৃত মানুষকে জলে সমাধিস্থ করবার সকল আচার পালনের ভার

বারবার মিগুয়েলার উপর এসেই পড়ে। মিগুয়েলা বিবাহিত, তার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা। অনাগত সন্তানের পায়ের ধাক্কার শব্দ শুনতে মিগুয়েলা কান পাতে নিজের স্ত্রীর তলপেটে। এমন বাধ্য স্ত্রৈণ স্বামী আর ধর্মাচারী মিগুয়েলার গোপন নতুন এক পরিচয়ের আভাস পেতে থাকি আমরা যখন সান্তিয়াগো নামক ত্রিশোর্দ্ধ আকর্ষণীয় চেহারার এক চিত্রশিল্পীর আবির্ভাব ঘটে পর্দায়। সান্তিয়াগো ছবি আঁকিয়ে, দ্বীপের মধ্যেখানে এক কুটিরে মাঝে মাঝে এসে একমনে ছবি আঁকে সে। সমুদ্র তীরবর্তী ওর থাকার ঘরটা তাই নিরবিচ্ছিন্ন নিয়ম পালনের মধ্যে যেন একটা ক্ষতের মতো। গ্রামের কেউ ওর কাছে ঘেঁষে না, কথা বলে না, কেবল ছবি আঁকার জন্য এখানে আসা নাকি অন্য কোনো উদ্দেশ্য তার কূল-কিনারা না করতে পেরে সবার অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় সে। এমন অবস্থায় পর্দায় দর্শকের সমস্ত কৌতূহলের সমাধান মেলে যখন আমরা দেখি মিগুয়েলা প্রত্যেকদিন বিকেলে স্ত্রীর কাছে মাছ ধরতে যাবার বাহানা করে মূল দ্বীপের বাইরে এক নির্জন গুহায় সান্তিয়াগোর সাথে মিলিত হয়, দেহের সব আবরণ ছেড়ে উন্মুক্ত হয়ে ওঠে তারা দুজন। সান্তিয়াগো আর মিগুয়েলার এই দৈহিক মিলন ঘটে লোকচক্ষুর অন্তরালে, সমাজ-সংস্কারের ভয়ে ভীত মিগুয়েলা অন্য মানুষের সামনে সান্তিয়াগোকে দেখেও না দেখার ভান করে। আত্মাভিমানী সান্তিয়াগোর পছন্দ হয় না মিগুয়েলার এই চারিত্রিক দ্বৈততা। সে আরো বেশি মিগুয়েলার পাশে থাকতে চায়, ভালোবাসতে চায়। সমাজ এবং স্ত্রী ভয়ে ভীত মিগুয়েলার কাছ থেকে বারবার সাড়া না পেয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত সান্তিয়াগো সেই বিপুল জলরাশির অতলে হারিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। সেটা কি অভিমান থেকে নাকি নিছক দুর্ঘটনায় তা আমরা জানতে না পারলেও গল্প এখানে থেমে যায় না। বরং এখান থেকে শুরু! হঠাৎ একদিন মৃত সান্তিয়াগোকে স্পষ্ট দেখতে পেতে শুরু করে মিগুয়েলা। শুধু দেখতে পাওয়া নয়, তাকে ছুঁতে এমনকি শারিরীকভাবে সম্ভোগ পর্যন্ত করতে পারে মিগুয়েলা। কিন্তু মিগুয়েলা ছাড়া পুরো দ্বীপের আর কেউ তাকে দেখতে পায় না। মিগুয়েলা বুঝতে পারে জলের নীচ থেকে সান্তিয়াগোর মৃতদেহ খুঁজে বের করে যথাযথ সৎকার করলে হয়তো সান্তিয়াগো এই পৃথিবী থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু সমাজের বেড়ীতে আবদ্ধ মিগুয়েলাও যে ভালোবাসে সান্তিয়াগোকে, অদৃশ্য সান্তিয়াগোর হাত ধরে পুরো দ্বীপে ঘুরে বেড়াতে পারে সে। লুকিয়ে ভালোবাসার এই অনন্য সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না মিগুয়েলা। চলতে থাকে আপাত অদৃশ্য অভিসার। কিন্তু সবটা কি এতোই সরল? অদৃশ্য এই সম্পর্কটাই যেন মিগুয়েলাকে বাস্তবে টেনে আনে, নিজের পরিচয় গোপনের পীড়া, স্ত্রী আর সান্তিয়াগো দুজনকেই মিথ্যা বলার দায়, সবকিছু মিগুয়েলাকে বিপর্যস্ত করে তোলে ধীরে ধীরে। বাকিটা জানার জন্য পুরো সিনেমাটা আপনাকে দেখতে হবে। কেবল দুই পুরুষের সম্পর্কের বাইরেও মানবিক সম্পর্কই যেন এই সিনেমার মূখ্য বিষয়। পেরুভিয়ান ডিরেক্টর হাভিয়ার ফুয়েন্তেসের প্রথম চলচ্চিত্রে শক্তিশালী অভিনেতা আর অভিনেত্রীরা পুরো সিনেমাকে আরো এগিয়ে নিয়ে গেছেন অনেকটাই। পাশাপাশি পেরুর উপকূলবর্তী দ্বীপের অদ্ভুত সুন্দর লোকেশন, দ্বীপের আচার-সংস্কৃতি আর সঙ্গীত, সবকিছুই যেন সিনেমার অবিচ্ছেদ্য অংশ। আন্ডারটো তাই হয়তো গৎবাঁধা সমকামী সিনেমার ভীড়ে হারিয়ে যায়নি, বরং পরিণত হয়েছে সব[illegible] মানবিক সম্পর্কের মিলনমেলায়। ■

Scanned with PDF MOBILE SCANNER

আন্ডারওয়্যার হাইজিন

এর উষ্ণতা প্রায় ৯৮ ডিগ্রী ফারেনহাইট, মানব শরীরের সবচাইতে উষ্ণতম এবং ঘর্মপ্রবণ এলাকা এটি যা কিনা ঈস্ট, ব্যাক্টেরিয়া কিংবা যেকোনো ফাঙ্গাল ইনফেকশনের জন্য আদর্শ স্থানে পরিণত হতে পারে যেকোনো সময়। শরীরের সবচাইতে স্পর্শকাতর অংশের সাথে জড়িত যে বস্ত্রবিদ্যা, তার স্বাস্থ্যকথা তাই জানা চাই আদ্যোপান্তে। কথা হচ্ছে ছেলেদের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বস্ত্রসঙ্গীকে নিয়ে, যাকে সচরাচর সবাই আন্ডারওয়্যার বা আরো উগ্রভাবে জাঙ্গিয়া বলে থাকে! বাংলাদেশের মতো যৌন শুচিবায়ুর দেশে আন্ডারওয়্যার নিয়ে ছেলেদের বিব্রত হওয়া কিংবা লুকিয়ে রাখার মনস্তত্ত্ব থেকেও যেহেতু এখনো আমরা পুরোপুরি মুক্ত নই, সেহেতু আন্ডারওয়্যার স্বাস্থ্যবিধি হয়তো আমাদের অনেকের জন্যই পুরোপুরি অজানা এক অধ্যায়। চলুন সেই অনুচ্চারিত নাক সিটকে দেবার মতো ব্যাপারগুলো নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করি, তবে আন্ডারওয়্যার শব্দটি দেখেই যাদের শরীর একটু নড়েচড়ে উঠেছিল, তাদেরকে আপাতত একটু হতাশ হতেই হচ্ছে! এ যে কেবল স্বাস্থ্যগাথা!

টু বি অর নট টু বি!

পরি কি না পরি সেটা হতে পারে অনেক বড় এক প্রশ্ন। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে বাংলাদেশের পুরুষদের মধ্যে বড় একটি অংশ তাদের পুরুষাঙ্গ প্যান্টের তলায় খোলামেলা রাখতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন! মানে তারা কোনো শিশ্নবন্ধনীর গ্যাড়াকলে আটকে পড়তে চান না! আমাদের রূপবানদের মধ্যে যারা বাসায় হুট-হাট অচেনা পুরুষ আনতে অভ্যস্ত, অন্য ছেলেদের এমন অভিরুচির সাথে তারা খুব একটা অপরিচিত নন। তবে মেডিক্যাল সায়েন্স এই ব্যাপারে খুব একটা উদার নয়। আন্ডারওয়্যার কেবল আমাদের ঘাম, কাম কিংবা 'ইউরেনাল ফ্লুইড' থেকেই বাঁচায় না, ঐ স্থানে জন্ম নেয়া নানারকম ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণ থেকেও আমাদের রক্ষা করতে পারে। তাছাড়া পাবলিক প্লেসে হঠাৎ করে শরীরের ডাকে সৃষ্ট উত্থানপতন অনেক সময়ই আপনাকে অপ্রস্তুত করে দিতে পারে। তাই কমান্ডো হয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগের আগে আরেকবার ভেবে দেখুন।

ঢাকার কথা!

ঢাকাকে যদি আমরা পুরো বাংলাদেশের মডেল হিসেবে ধরতে চাই, যেখানে ছেলেদের আন্ডারওয়্যার পরার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি, তবে আমাদের হতাশ হতে হবে তাদের আন্ডারওয়্যার আচরণবিধি দেখে! বেশিরভাগ ছেলের সাথে কথা বলেই দেখা গেছে যে, তারা মনে করে 'যো দিখতা হ্যা ও বিগতা হে!' প্যান্টের নিচে অপ্রদর্শিত এই কাপড়ের টুকরোর প্রতি সীমাহীন উদাসীনদের মধ্যে অনেকের গন্তব্যস্থলই তাই ঢাকার নিউমার্কেট কিংবা ফার্মগেটের খোলা দোকান। সস্তা দামের লোভে পড়ে নিম্নমানের কাপড় আর বাজে ফিটিংসের হাতে সপে দিচ্ছি তাদের সবচেয়ে মূল্যবান রত্নটিকে!

কাপড়ের স্বাস্থ্য

জ্বী, পড়েছেন ঠিক! কাপড়েরও স্বাস্থ্য আছে, যার প্রভাব পড়তে পারে আপনার শরীর কিংবা মনেও। সস্তায় ঢাকা কলেজের রাস্তার উল্টোপাশ থেকে কাপড় কেনার আগে বুঝতে চেষ্টা করুন যে আপনার শরীরের যে সংবেদনশীল অংশের জন্য কাপড় কেনার

Scanned with MOBILE SCANNER

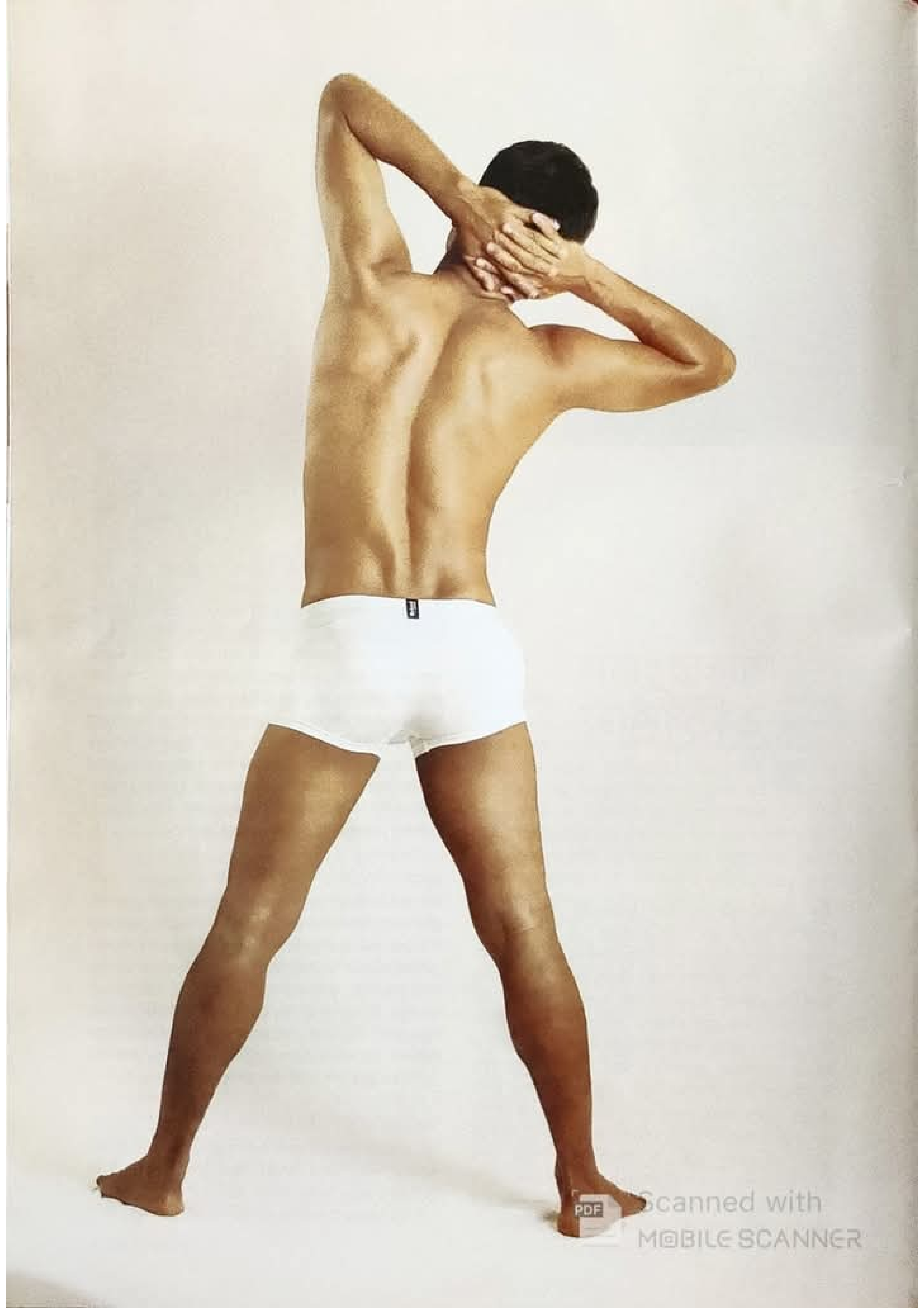

Scanned with
MOBILE SCANNER

আগে আপনাকে কিছুটা হিসেবী আর পুরোটাই বেহিসেবী হতে হবে। হিসেব করুন আপনার শরীর আর তার ত্বক নিয়ে। শরীরের সবচেয়ে লাগোয়া কাপড়ের মান নিয়ে। অনেকের 'সিন্থেটিক ফেব্রিকে' নানারকম ত্বকীয় সংবেদনশীলতা রয়েছে, গাড্ডুর মতো সারাদিন প্যান্টের উপর চুল্কোতে না থেকে একবার দেখে নিন কি ফেব্রিকের আন্ডারওয়্যার পরছেন। এমনিতে 'কটন' বা 'অরগ্যানিক কটনে'র অন্তর্বাস নিঃসন্দেহে সবচেয়ে স্বাস্থ্যসম্মত। তবে প্রচুর ঘামেন যারা, তাদের জন্য পলিস্টার, নায়লন বা অন্যান্য সিন্থেটিক মিশ্রণের 'ব্রিদেবল' আন্ডারওয়্যার উপযুক্ত হতে পারে। আবার জিম, সাইক্লিং কিংবা বেশি ঘেমে যাবার মতো কাজ করলে সেসবের হিসেব কষে আলাদা রকমের আন্ডারওয়্যার পরা যেতে পারে, যেগুলোর ঘাম শোষণ ক্ষমতা সাধারণ কাপড়ের চেয়ে বেশি। তবে এসব দেখে জিনিস কিনতে পকেটে ভারটা একটু বেশি পড়লেও এবার সময় আপনার বেহিসেবী হবার!

"দিনের পর দিন না ধোয়া আন্ডারওয়্যার'র সাথে এক গ্রাম অব্দি বর্জ্য লেগে থাকা সম্ভব!"

দি সিক্রেট লাইফ অফ জার্ম
ডা: ফিলিফ তিয়ার্নো

আন্ডারওয়্যার'র খেরোখাতা

বাংলাদেশের ছেলেদের জন্য খুব জরুরি এই হিসেবটা মেলানো, তাই চাইলে কাগজ কলমে লিখে রাখতে পারেন! নিদেনপক্ষে দশটি আন্ডারওয়্যার আপনার বাড়িতে থাকা উচিত, শুধু আপনার একার! এক আন্ডারওয়্যার একবার পরে না ধুয়ে তার ভিতর দ্বিতীয়বার নিজেকে পুরে দেয়ার অর্থ হলো নিজেকে লাখ লাখ ব্যাক্টেরিয়ার হাতে সঁপে দেয়া! সপ্তাহের সাত দিন সাতটি আলাদা আন্ডারওয়্যার পরুন, ধোয়া বা অন্য কোনো 'ইমার্জেন্সি'র জন্য রাখুন আরো অতিরিক্ত তিনটি। এক আন্ডারওয়্যার পরে চব্বিশ ঘন্টার বেশি কাটানো কখনো স্বাস্থ্যকর নয় বলা বাহুল্য। তাই দুপুরবেলা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাসায় ফিরে খুলে ফেলা আন্ডারওয়্যার আবার সন্ধ্যায় আড্ডা দেবার আগে পরে যাবেন না দয়া করে!

ধোলাই

১৬০ থেকে ১৮০ ডিগ্রী ফারেনহাইটে আন্ডারওয়্যার ধুয়ে ফেললে তার সমস্ত জীবাণুনাশ হয়। তবে বাস্তবে কাপড় সেদ্ধ তো আর সবসময় সম্ভব নয়, তাই পরিষ্কার করুন যত্ন করে। নিজের বাসার কাজের লোকের উপর ভরসা না করে নিজেই হাত লাগান কিংবা ওয়াশিং মেশিনে ছাড়ুন। নিয়মিত ধোলাই আপনাকে দেবে জীবাণুমুক্ত সুস্থ আন্ডারওয়্যার!

ঈদে চাই নতুন আন্ডারওয়্যার!

দেশের বাইরে যদি তাকাই, অনেক দেশের ছেলেরাই নিজেদের 'লাকি আন্ডারওয়্যার ট্রেন্ড' অনুসরণ করে, তাদের চাকরি কিংবা আরো গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলিতে তারা সেটা পরে এবং মায়া কাটিয়ে ফেলে দিতে পারে না। কিন্তু আমরা কি করি? কালের বিবর্তনে সব পালটে গেলেও প্যান্টের নিচে আন্ডারওয়্যার থেকে যায় সেই একই। আর সেটা কোনো মায়ার বশে নয়, নিছক আলসেমি বা আরো ভালো বললে নোংরামি। একটা ছোট্ট ফুটো? হলদেটে দাগ? ঢিলা ইলাস্টিক? ছুড়ে ফেলে দিন! আন্ডারওয়্যার 'ট্র্যাশ' করবার আগে দ্বিতীয়বার ভাবতে হবে না। এটি বোধহয় নিজের টাকায় কেনা সেই একমাত্র বস্তু যেটা যত দ্রুত ফেলে দেয়া যায়, শরীরের জন্য ততোই মঙ্গল। অভ্যাস করুন নতুন আন্ডারওয়্যার বেশি বেশি কেনার। যেকোনো উৎসব বা ছোট ছোট কেনাকাটার সাথে একটা করে আন্ডারওয়্যার কেনাটা আপনার একবারের টাকার ধাক্কা অনেকটাই সামলে দিতে পারে।

ব্র্যান্ড পরুন

আপনি খুব একটা ব্র্যান্ড ফ্রেন্ডলি না? তাতে কি! শরীরের এই একটা জায়গার জন্য কিছুটা মানিয়ে নিতেই হবে। আন্ডারওয়্যার'র সাথে যেহেতু ফিটিংস আর স্বাচ্ছন্দ্যবোধের ব্যাপার জড়িত, খুঁজে বের করুন আপনার ব্র্যান্ড যেটা আপনার শরীরের সাথে মানানসই। নানারকম 'এন্টি ব্যাক্টেরিয়াল ফিনিসে'র তৈরি নামী-দামী ব্র্যান্ডগুলো তো আছেই, যদি না পোষায় তো ক্যালভিন ক্লেইন কিংবা এইচএমএন না কিনে দেশীয় ব্র্যান্ডের দিকেও ঝুঁকতে পারেন। দুশো থেকে চারশো টাকার মধ্যে এক্সট্যাসি কিংবা ওয়েস্টেক্স-এর ভালো মানের 'কটন' আন্ডারওয়্যার পেয়ে যাবেন সবাই।

অন্যের আন্ডারওয়্যারকে না বলুন

অনেকেই তাদের ভাই, রুম-মেট বা অন্যদের পরা আন্ডারওয়্যার নিয়ে পরে ফেলে। আপনার এমন কোনো ব্যাপার থাকলে আমাদের আর কিছু বলবার নেই! তবে অন্যের আন্ডারওয়্যার শুঁকে দেখবার 'লিবিডো' যদি কারো থাকে তবে তাতে কোনো স্বাস্থ্যটিকাই কাজ করবে না।

বাইরে থেকে ঘরে ফিরেই আন্ডারওয়্যার খুলে ফ্যানে শুকিয়ে পরা বন্ধ করুন, বছরের পর বছর এক জোড়া আন্ডারওয়্যার পরবার মানসিকতা গা ঝাড়া দিয়ে ফেলে দিন, অন্তত নিজেকে সুস্থ রাখার খাতিরে। আর তা নাহলে নানারকম চর্ম সমস্যায় জর্জরিত আপনার সাথে যে মানুষটির সম্পর্ক আন্ডারওয়্যার পর্যন্ত গড়াবে, তার কাছে হয়তো আর গোপন কথাটি রবে না গোপন! ■

Scanned with MOBILE SCANNER

মধু-গৌরাখ্যান

"Long sunk in superstition's night,
By Sin and Satan driven,
I saw not, cared not for the light
That leads the blind to Heaven"

hymn sung and composed by Michael Madhusudan Dutt

১৮৪৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি, কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম চার্চের বাইরে দুপুরের ভাঙ্গা ভাঙ্গা রোদ তখন মধ্যাহ্নের ছায়া কাটিয়ে অস্তাচলের দিকে ছুটছে, চার্চের ভিতরে আর্চ ডিকন ডিয়াল্ট্রির চার দেয়াল কাঁপিয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এই যে হিম, তার রচয়িতা এবং গায়ক স্বয়ং যেন মিথ্যা শব্দের কর্পূরে ডোবানো এই গানের সুর শরীরে ধারণ করে নীল হয়ে আছে। ইতিহাস তখন সাক্ষী হচ্ছে অহংকারী, মদ্যপায়ী, অশান্ত আর ঈশ্বরবিদ্রোহী এক কবির ধর্মান্তকরণ যজ্ঞের, যে কিনা কেবল হিন্দু ধর্ম সংক্রান্ত সংস্কার বিরোধীই নয়, যে-কোনো চাপিয়ে দেয়া সামাজিকতার প্রতি বিতৃষ্ণ। রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় তখন হয়তো গোপনে চূড়ান্ত বিজয়ের আত্মশ্লাঘা উপভোগ করছিলেন মনে মনে, মধুসূদন দত্ত নামক কৃষ্ণাকায় কুড়ি বছরের ঔদ্ধত্যপূর্ণ এই বালকের নামের শুরুতে মাইকেল উপাধি যোগসমেত তাকে যীশুর পদতলে ভূপাতিত করবার আনন্দে! দুর্দান্ত মেধাবী এই ছেলেটি খুব ছোটবেলা থেকেই প্রচণ্ড প্রতাপে নিজের প্রতিভায় সবাইকে তুচ্ছজ্ঞান করে গিয়েছে। হিন্দু কলেজের ইংরেজির ছাত্র মধুসূদন ততোদিনে বাইরন, শেলী, সেক্সপিয়ার সবাইকে মননে ঠাঁই দিয়ে হিন্দু কলেজের সমস্ত শিক্ষকদের প্রতিই এক ধরনের প্রকাশ্য তাচ্ছিল্য পোষণ করত। দৃদণ্ড প্রতাপশালী পিতা রাজনারায়ণ দত্ত ছেলে মধুর ন্যায়-অন্যায় কোনো ইচ্ছাই অপূর্ণ রাখেননি। ছেলের বেহিসেবী খরচী জীবনে বাবা দুহাতে পয়সা ঢেলেছেন হয়তো এটা টের পেয়েই যে পুরো ভূ-ভারতে এমন অস্বাভাবিক প্রতিভা খুব বেশি নেই। অল্প বয়সেই বাবার সামনে ঠায় মাতাল হয়ে পড়ে থাকা মধু তখন ভারতীয় আচার-সংস্কৃতিতে পুরোপুরি বীতশ্রদ্ধ। অনেকেই তাই ধুতি ছেড়ে আচামকা কোট-প্যান্ট পরা মধুসূদনের ইংল্যান্ড প্রীতির সাথে তার ধর্মান্তরিত হওয়াকে গুলিয়ে ফেলেন। অনেকের মতে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ের দেবকী নাম্নী রূপবতী বিদূষী দ্বিতীয় কন্যায় আসক্ত হয়ে তার পিতাকে খুশি করাতেই ধর্মান্তরিত হন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। কিন্তু প্রকৃত সত্য কি তাই? দেবকী নাম্নী সেই কন্যার বয়স তখন ততোটাই কম ছিল, যত কম বয়েসী মেয়ের সাথে পূর্বরাগ কল্পনাতীত। তবে বিলাসী অট্টালিকা, নিশ্চিন্ত শয্যা আর বেহিসেবী সুরা[illegible]নকে অনিশ্চয়তায় ঠেলে দিয়ে তৎকালীন

Scanned with MOBILE SCANNER

আদি হিন্দু সমাজের সবচেয়ে পাপের পথ বেছে নিয়ে সাত পুরুষকে নরকের দিকে কেন ঠেলে দিয়েছিলেন তিনি? ঈশ্বরে অরুচি যার নিয়ে বেড়ে ওঠা, সেই ঈশ্বরের পদতলে অবনত হবার সংগীত রচনা করলেন স্বয়ং আপন কলমে।

পুত্রগুণমুগ্ধ পিতা রাজনারায়ণ দত্ত ছেলের এই কীর্তিকে মাথা পেতে বরণ করেননি। মধুসূদন এবার সফলভাবেই প্রশ্রয়দাতা পিতার মধ্য থেকে তেজী আইনব্যবসায়ী রাজনারায়ণকে উস্কে বের করে আনে। পাইক, পেয়াদা আর লেঠেল বাহিনী সব জড় করে রাজনারায়ণ ছেলের খ্রিস্টান হওয়া ঠেকাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যতোই প্রতাপশালী হোক না কেন, স্বয়ং লর্ড বিশপ যে ছেলেকে ফোর্ট উইলিয়ামে আশ্রয় দিয়েছে, তাকে সেখান থেকে ছিনিয়ে আনা অসম্ভব ছিল, অন্তত সেই আঠারো শতকে ব্রিটিশ রাজের বাস্তবতায়। আর পিতার এই অক্ষম আক্রোশের মধ্যেই আমরা হয়তো আমাদের প্রশ্নের জবাব খুঁজে দেখতে পারি।

এমন বুদ্ধি, শিক্ষা আর সম্ভ্রান্ত ঘরের সুপাত্রের জন্য রাখুটিয়ার জমিদার নিজ উদ্যোগেই দত্ত পরিবারের সাথে সম্বন্ধ করতে এগিয়ে আসেন। আর উঁচু বংশের বিয়ের প্রস্তাব হেলায় হারানোর মতো দুর্বল বুদ্ধির লোকও নন রাজনারায়ণ, তাই হিন্দু কলেজের সবচেয়ে তুখোড় এই ছেলেটির সাথে গ্রাম্য এবং প্রায় অশিক্ষিত রাখুটিয়ারাজের কনিষ্ঠ কন্যার বিয়ের জন্য হন্যে হয়ে ওঠেন পিতা। কিন্তু ইংল্যান্ডের সমাজ, সাহিত্য বা কাপড় পরার ধরন পর্যন্ত যাকে অবিরল টানছে, মনে মনে যে নিজের কাছে বায়রনের সমকক্ষ, তার পক্ষে এই সম্পূর্ণ অচেনা এবং প্রায় গ্রাম্য কমবয়েসী মেয়ের সাথে ঘর করার চিন্তা দুঃসহ মনে হবে, সেটাই স্বাভাবিক। সেই বিয়ে অস্বীকার করবার আরো অনেক উপায় থাকতেও মধু কেন ধর্মত্যাগী হবার সিদ্ধান্তই নেয়? যে ঘটনা কেবল তাকে এই বিয়ে থেকেই নয়, ভবিষ্যতের জন্যেও জাত সংবেদনশীল আদি হিন্দু সমাজে বিয়ের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেয়, পিতার সমস্ত সম্পদ এবং প্রতিপত্তি হতে খারিজের আশংকা তৈরি করে, যে পিতা নিজে চাইলেই হয়তো ছেলেকে সাতবার বিলেত ঘুরিয়ে আনতে পারতেন। পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আরেকটু নাড়াচাড়া করতে থাকলে হয়তো এই হঠকারী সিদ্ধান্তের ধোঁয়াশা কেটে আরেকটা নাম আমাদের কাছে স্পষ্ট হতে থাকে। গৌরদাস বসাক!

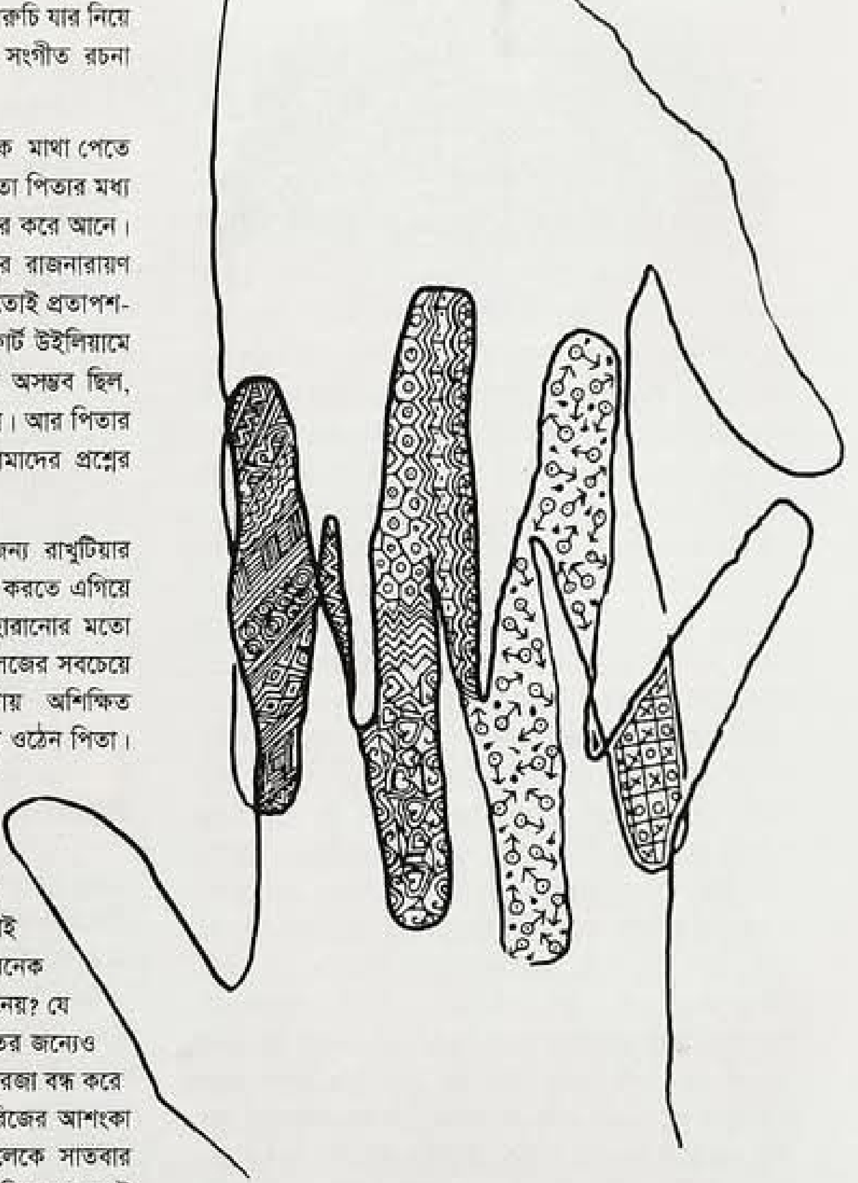

হ্যাঁ, বাঙালি রেনেসাঁর আরেক পুরোধা, মধুর হিন্দু কলেজের সবচেয়ে প্রিয় সহপাঠী গৌরদাস বসাক। লম্বাটে ফর্সা মুখ আর ছিপছিপে গড়নের লাজুক এই ছেলেটির প্রতি মধুসূদনের অতিমাত্রায় আসক্তি আজ আর হয়তো ভালোবাসার অস্পষ্ট কোনো ইঙ্গিত নয়। ইতিহাসের প্রায় দুশো বছরের ধুলো জমা মলিন ছবিটায় ফুঁ দিলে আজও সেই অনুচ্চারিত প্রণয়ের স্পষ্ট পরিভাষা নজর এড়ায় না। ১৮৩৩ সালে মধুর হিন্দু কলেজে ভর্তির পর হতে ১৮৪৮ সালের প্রায় কপর্দকহীন অবস্থায় মদ্রাজ যাওয়ার আগ অবধি প্রায় এক দশক সময়কে আমরা ভাগ করে নিতে পারি তিন ধাপে: মধু-গৌর সম্পর্কের সূচনা, ক্লাইম্যাক্স আর মধুর কলকাতা ছেড়ে মদ্রাজ গমনের মাধ্যমে শারিরীক বিচ্ছেদ। মধুর প্রথম দিককার কবিতার সবটা জুড়েই ছিল গৌর। গৌরমুগ্ধ মধু তার বেশিরভাগ কবিতার উৎসর্গপত্রে গৌরদাসের নাম উল্লেখে রাখ-ঢাক করেননি। গৌর কখনো বিব্রত, কখনো উচ্ছ্বসিত, কখনো ছন্নছাড়া মধুর হঠকারী এই প্রেমে আতংকিত। গৌরদাসের প্রতি মধুর এই অকিঞ্চিৎকর ভাবাবেগকে অনেকেই সেই শতাব্দীর দুই পুরুষের নিবিড় বন্ধুত্বের সাথে গুলিয়ে ফেললেও তাদের বাদবাকি সহপাঠীদের নজর এড়ায়নি এই সখ্যতার অতিশায্য। বিভিন্ন রাতে গৌরকে নিজ বাসায় রেখে দেবার জোরাজুরির কথাও মধুর অন্যান্য হিন্দু কলেজ সহপাঠীদের জীবনীতে নানা সময়ে উঠে এসেছে। তবে এই সম্পর্কের শারিরীক ঠিকুজি মেলাবার চেষ্টাটা হয়তো নিতান্তই গৌণ। সম্পর্কে শুদ্ধতার সেই অর্বাচীন কৌলিণ্যের প্রমাণ পেতে এই শব্দাতীত সম্পর্কের কিছু শব্দের কারুকাজ খেয়াল করা যেতে পারে। গৌরকে পাঠানো মধুর অমূল্য ঐতিহাসিক এসব অল্প শব্দের চিঠিতে অনেক না বলা আবেগ যেন কোটি শব্দের শক্তি নিয়ে আমাদের মনে ঝড় তোলে। বলা বাহুল্য সব চিঠিই ইংরেজিতে লিখতেন মধু:

"I am reading Tom Moore's Life of my favorite Byrone-a splendid book upon my word! Oh! How should I like to see you writing my life if I happened to be a great poet-which I am almost sure I sahll be if I can go to England!"

১৮৪০-এর গৌরদাসকে মধুর লেখা ছোট্ট এই কয়েক লাইনের

Scanned with MOBILE SCANNER

চিঠিটায় গৌরকে নিজের জীবনী লিখে দেওয়ার আবেদনের আড়ালে অনুচ্চারিত যে প্রণয় প্রার্থনা, জীবনী লেখার শেষ দিনটা পর্যন্ত তাকে পাশে পাবার যে বাসনা, সময়ের এই প্রান্তে বসেও তার উত্তাপ টের পাওয়া যায়। এই পুরোদস্তুর সম্পর্কের মাঝে বিয়েটা হয়তো এক বিষফোঁড়ার মতো ছিল মধুর কাছে। হঠকারী উচ্ছৃংখলতায় পারঙ্গম মধু নিজের সেই উন্মত্ত সম্পর্কের খাতিরেই হয়তো জীবনের শ্রেষ্ঠ ভুল সিদ্ধান্তটি নিয়েছিলো সেদিন। বিয়ের জন্য জবরদস্তি করা পিতা আর অন্যদিকে উদাসী ভাবুক প্রেমিকের অসাড়তা, সবাইকে তাক লাগিয়ে ধর্ম পালটে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়াটাই হয়তো সেই বয়সী বেপরোয়া মধুর জন্য আদর্শ সিদ্ধান্ত ছিল, কাউকে চমকে দিতে পারাটা যাকে কিনা শিশুসুলভ আনন্দ দিত। নিজের বিয়ের পথ চিরতরে বন্ধ করে মধু কি চেয়েছিলেন সেটা স্পষ্ট করে আজ কারোর পক্ষেই হয়তো বলা সম্ভব নয়। যে সম্পর্কটা গৌরকে তখনো তাতিয়ে তোলেনি ততোটা, তার দিকে গৌরের নজর ফেরাতেই নাকি কেবল মিশনারি চার্চের মাধ্যমে ইংল্যান্ড ভ্রমণ, কি কারণে মধু পাগলের মতো নিজ পিতার সমস্ত ঐশ্বর্যকে এক ফুঁৎকারে উড়িয়ে দিয়ে যীশুর পদতলে আশ্রয় নিলেন, সেসব অনেক না মেলা প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়েই হয়তো এই দুই পুরুষের সান্নিধ্যঘন সম্পর্কের দিকে নজর চলে যায় আমাদের। তাই আপাতত এই ফোর্ট উইলিয়ামের চার্চ আর ধর্মান্তরিত হবার আয়োজনকে মধু-গৌরাখ্যানের ক্লাইমেক্স ভেবে নিলে বিষম কোনো ভুল হবার সম্ভাবনা কম। শেষ অবধি পিতা এবং তার সমস্ত সম্পদ থেকে সম্পর্কচ্যুত মধুকে চলে যেতে হয় মদ্রাজ, ভাগ্যের অন্বেষণে। আর সেই বাস্তবতাই মধু আর গৌরের শারিরীক সান্নিধ্যের ইতি টানে। মদ্রাজে আর্থিক অনটনে বিধ্বস্ত এবং মানসিকভাবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত মধু যেন গৌরের বিকল্প খোঁজাতেই মত্ত হয়ে ওঠে। কোলকাতার গৌর তখন তার আয়ত্তের অনেক বাইরে। 'অরফ্যান এসাইলামে'র রেবেকা ম্যাক্টাভিসের সাথে বিয়ের মাধ্যমে তার অতৃপ্ত সেই জীবনে নতুন কিছুর স্ফুরণ ঘটাবে আশা করেছিলো মধু। তবে ইতিহাস বলে, এই বিয়ে কোনোদিক দিয়েই তৃপ্তি দেয়নি মধুকে। সম্পূর্ণ ব্যর্থ বিয়ের গ্লানি কাটাতে রেবেকাকে ছেড়ে হেনরিয়াটার সঙ্গে এক সাথে থাকা শুরু করেন কবি। কোনো সামাজিকতার ধার না ঘেঁষে তার আগের স্ত্রী রেবেকার সাথে ডিভোর্স যেমন নেননি তিনি, তেমনি হেনরিয়াটাকে নতুন করে বিয়েও করেননি মধু। কেবল 'লিভিং টুগেদার'র এই সম্পর্কে চার সন্তানের জনক হয়ে ওঠা মধু তখনো তার পূর্ব প্রণয় বলয়ের বাইরে ছিল না। ১৮৬০ সালের কোনো এক রবিবারে লেখা চিঠিটা আপনাকে কতটা ভাবায় দেখুন:

> My dearest Gour,
> I have left my old lodging. In my new, I shall be most happy to see you, my own dearest friend. Alas. I am miserable. Come to see your unworthy but loving
> MSD

পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আরেকটু নাড়াচাড়া করতে থাকলে হয়তো এই হঠকারী সিদ্ধান্তের ধোঁয়াশা কেটে আরেকটা নাম আমাদের কাছে স্পষ্ট হতে থাকে। গৌরদাস বসাক!
হ্যাঁ, বাঙালি রেঁনেসার আরেক পুরোধা, মধুর হিন্দু কলেজের সবচেয়ে প্রিয় সহপাঠী গৌরদাস বসাক। লম্বাটে ফর্সা মুখ আর ছিপছিপে গড়নের লাজুক এই ছেলেটির প্রতি মধুসূদনের অতিমাত্রায় আসক্তি আজ আর হয়তো ভালোবাসার অস্পষ্ট কোনো ইঙ্গিত নয়।

বাংলার অন্যতম মহাকাব্য মেঘনাদবধ লেখবার সময়টাতেও কি মধু এড়াতে পেরেছিলেন এই সম্পর্কে প্রভাব? কবিতার প্রথম সর্গের প্রথম বর্ণনা কি কারো নজরে পড়েছে:

'তুমিও আইস, দেবি, তুমি মাধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচে মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।'

জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও এই দুই পুরুষ জুটির সম্পর্কে কোনো চিড় ধরেনি। জীবনের শেষ দিকটায় নানা হতাশায় জর্জরিত মধু বরাবরই গৌরের স্মরণাপন্ন হয়েছেন, গৌরের স্নিগ্ধ চিঠির সান্নিধ্য কবিকে ভাসিয়ে নিয়ে যেত শান্তির নীড়ে। আমাদের লেখাটাও না হয় সেই নিরন্তর নীড়েই বাসা খুঁজে নিক:

> My dear Gour
> How strange! The whole of yesterday I thought of you and asked myself repeatedly if you were coming home this year. I have just recovered the effect of a severe accident, but I shall be very glad to see my dear old friend and talk of old days. Will the afternoon of Tuesday next suit you?
> P.S. You know, old boy, I never write letters unless I have something of importance to communicate. So, you must not blow me up for being a bad correspondent!

Scanned with
MOBILE SCANNER

সেদিন দু'জনে

একদম শুরুতে যদি আপনাদের কাছে জানতে চাই যে নিজের ভিন্নরকম যৌন এবং মানসিক প্রবৃত্তির ব্যাপারটা প্রথম কখন টের পেলেন আপনারা দু'জন?

সোহেল: বিষয়টা আমার ব্যাপারে একটু ভিন্ন। আমি সেই নব্বইয়ের দশকে প্রথম যখন ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া আসা শুরু করি, সেসময় এখনকার মতো ছেলে-ছেলে সম্পর্কের ব্যাপারটা এত খোলামেলাভাবে আলোচনা হত না। শুরুর দিকে আর দশজনের মত আমার কাছেও ব্যাপারটা বেশ ঘেন্নার ছিল। এসব নিয়ে অতটা ভাবিও নাই। আমার আগ্রহ মেয়েদের দিকেই বেশি ছিল। ২০০৬-এর শুরুর দিকে একদম পরিণত অবস্থায় আমি ব্যাপারটার সাথে প্রথম পরিচিত হই। অনলাইনের মাধ্যমেই একজনের সাথে আমার প্রথম দেখা এবং যৌন সম্পর্ক তৈরি হয়। সেই প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা আমার কাছে কিন্তু মোটেই ভালো লাগেনি। দুইটা ছেলের মধ্যে মানসিক সম্পর্ক আমি তখন কল্পনাও করতে পারতাম না

হাবিব: আমার এরকম না, আমি যখন থেকেই যৌনতা ব্যাপারটা বুঝতে শুরু করি, তখন থেকেই জানি যে আমার ছেলেদের পছন্দ। তবে আমার সেই বেড়ে ওঠার বয়স এবং সময়টা এখনকার চেয়ে অনেক বেশি অন্যরকম ছিল। আমি যে মানসিকভাবে অসুস্থ নই সেটা বুঝতেই আমার অনেক লম্বা সময় লেগে যায়। এরপর যখন আমি প্রথম মানুষের সাথে মেলামেশা শুরু করি, এর মধ্যেই একজন আমাকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে ফেলে। সম্পর্ক নিয়ে বেশি ভাবা, কাউকে 'ফ্যান্টাসি' করা কিংবা হা-হুতাশ করবার বহু আগেই আমি আসলে একটা সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ি।

নিজেদের প্রথম পরিচয় আর সেখান থেকে ভালো লাগাটার শুরু কিভাবে?

হাবিব: আমাদের পরিচয়ের শুরুটা আসলে একটা 'কমন সার্কেলে'র মাধ্যমে। একটা বড় 'ক্রাউড' ছিল যাদের সাথে নানা অনুষ্ঠানে আমরা যেতাম। সেখানে আমাদের খুব কাছের এক বন্ধু ছিল যার মাধ্যমে ওর সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়। আমাদের দুজনের মধ্যেই ধূমপানের অভ্যেসটা ছিল। বলা চলে, এটাই আমাদের দুজনকে অনেকটা কাছে নিয়ে আসে। ওর সাথে সিগারেট খেতে খেতে আর গল্প করতে করতেই আমার এক ধরনের আকর্ষণ তৈরি হতে থাকে ওর প্রতি। আমার জীবনে তখন পারিবারিকভাবে কিছুটা দুর্বল সময় যাচ্ছিল। ওর বয়স আমার সমান হবার কারণে ও খুব দ্রুত আমার ব্যাপারগুলি ধরতে পারতো। ভালোবাসা ব্যাপারটা তখন শুরু না হলেও এসব আমাদেরকে অনেক কাছে টেনে আনে। শারিরীক সান্নিধ্যে তৃপ্তির ব্যাপারটাও এখানে দরকারী অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে অবশ্যই।

সোহেল: আমাদের মধ্যে কখনোই 'প্রপোজ' করবার ব্যাপার ওভাবে আসেনি। ওর সাথে আমার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রচুর দেখা হতো, সেখান থেকে এক ধরনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক শুরু হয়। তখন মনের মধ্যে কিছু তৈরি হলেও কিভাবে প্রকাশ করতে হয় জানতাম না। এর মধ্যে একসময় ওর সাথে আমার একবার ঝগড়া লাগে আর তারপর ওর কিছু বন্ধুদের নিয়ে ও ঢাকার বাইরে ঘুরতে যায়। ঐ সময়টায় ওর অনুপস্থিতিতে আমি প্রথম টের পাই যে আমিও অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছি।

আপনারা তো লম্বা সময় ধরে একসাথে আছেন, এর মধ্যে সমস্যা হয়নি? বা বড় কোনো ঝগড়া?

হাবিব: কাল রাতেও তো ঝগড়া হল! প্রায়ই হয়, অনেক মতের অমিল হয়, আবার ঠিক হয়ে যায়। খুব বেশিদিন যে একসাথে আছি তা নয়, তবে সামনের পহেলা বৈশাখে ছয় বৎসর হয়ে যাবে। এর মধ্যে বোধহয় পনেরো দিনের চেয়ে বেশি সময় কখনো টানা কথা না বলে থাকিনি। কেউ না কেউ মান ভাঙ্গাতে এগিয়ে আসে।

একটা সম্পর্ককে সঠিক ভাবে লালন করার জন্য কি কি প্রয়োজন?

সোহেল: প্রথমত, বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসটা কিন্তু যৌনতার বিশ্বাস না, বিশ্বাসটা হচ্ছে যে 'সে আমার'। ধরো ও অফিসে টাকার হিসেব মেলাতে পারলো না বা প্রমোশন পেল; দু'ক্ষেত্রেই ওর যখন আমার কথা প্রথমে মনে পড়ে বা আমাকে প্রথম জানায়, সেটাই আমার কাছে বিশ্বাস। আমার তো ওর মায়ের সাথেও খুব ভালো সম্পর্ক। ওর মা কিন্তু এখনো আমরা দুজন একসাথে কোথাও গেলে ফোন করে আমি খেয়েছি কিনা সেটা আগে জিজ্ঞাস করে। এটাও কিন্তু একটা নির্ভরতা বা বিশ্বাসের জায়গা। এই পারিবারিক সম্পটাও কিন্তু একটা বিশ্বাসের জায়গা। দ্বিতীয়ত, শারীরিক সুখের ব্যাপারটা আর তৃতীয় ব্যাপারটা হলো অর্থনৈতিক। শুনতে খারাপ লাগলেও কোনো সম্পর্কই কিন্তু আসলে অর্থনীতির বাইরে নয়। আমাদের পরিণত বয়স এবং অর্থনৈতিক স্থিতি এই সম্পর্কে বেশ বড় রকমের ভূমিকা রেখেছে। এখানেও সেই বিশ্বাসের ব্যাপারটা চলে আসে।

হাবিব: আমি বলবো প্রথমত, আমরা অর্থনৈতিক ব্যাপারে একদম 'ইনসিকিউর' না। দ্বিতীয়ত, আমরা দুজনই দুজনের পরিবারের কাছে কমবেশি পরিচিত, এই পারিবারিক মেলামেশা সম্পর্কটাকে আরো সহজ করেছে। আর দিনশেষে আমাদের বোঝাপড়ার জায়গাটাতো আছেই। আমাদের দুজনের বয়স কাছাকাছি হওয়াতে আর অনেকদিন থেকে পরিচয় থাকায় আমরা দুজনই দুজনকে বেশ ভালোভাবে বুঝতে পারি। দিনশেষে যাই হোক না কেন, আমার যে জায়গাটা ওর জীবনে আছে, সেটা যে অন্য কেউ নিতে পারবে না সেই 'সিকিউরিটি' বোধটা কিন্তু আমাদের দুজনের মাঝেই আছে আর এটা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

Scanned with PDF MOBILE SCANNER

হাবিব: জীবন কিন্তু থেমে থাকে না, জীবনে কিন্তু সব ঘটতে থাকে। ভালোলাগা, কাছে থাকা, দূরে থাকা, আস্থা, আস্থাহীনতা এসবই চলতে থাকবে। এর ভিতর থেকেই একজন আরেকজনের কাছে আছে কিনা সেটা খুঁজে বের করতে পারলেই সেটাকে সম্পর্ক বলা যায়, আমার মতে। আমরা নিজেদের মধ্যে বহুগামী প্রবণতা নিয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনা করি, এটা কিন্তু সম বা বিষমকামী সবরকম সম্পর্কেই হতে পারে। এই সব টানাপোড়েন শুধু আমাদের নিজেদের সৃষ্টই না, এসবের মধ্য দিয়েই সব সম্পর্ক প্রবাহিত হয় আর মানুষ সেটাকে সম্পর্ক বলে চিনতে শেখে।

একটা সম্পর্কের কোনো পর্যায়ে গিয়ে বলা যায় যে সেটা একটা সম্পর্ক?

সোহেল: আমাদের প্রেমটা আসলে ঐ 'লাভ ইউ লাভ ইউ' ধরনের 'টিনেজ' প্রেমের পর্যায়ে নেই। একদম যে বলি না তা নয় কিন্তু এরপরেও আমার কাছে আমাদের সম্পর্কটা এখন আসলে পরিণত এবং পরিপক্ক একটা সম্পর্ক। কাল রাতেও কিন্তু আমাদের বড় একটা ঝামেলা হয় যেটার পরে অন্য অনেকেই হয়তো আজকের এই একসাথে বসে ইন্টারভিউ দেয়ার ব্যাপারটা ভাবতে পারতো না। আমার কাছে এই অদ্ভুত না বলা বোঝাপড়াটাই আসলে সম্পর্ক।

আমাদের মধ্যে অনেকেই বলে যে ছেলে-ছেলের 'রিলেশনশিপ' টাকে না, এটা আসলে সম্ভব না। আপনারা এ ব্যাপারে কি বলবেন?

সোহেল: আমি এক্ষেত্রে খুব অপ্রিয় একটা কথা বলবো। আমরা আসলে কম বেশি কিছুটা বহুগামী, আমাদের মন অনেক ছড়ানো-ছিটানো থাকে। এখন ওর সাথে আমার সম্পর্ক এতোদিনের হয়ে গেছে যে এই সম্পর্কটাকে নাড়িয়ে দিয়ে এর মধ্যে কারো ঢোকা বেশ মুশকিল। অন্যদের ক্ষেত্রে বহুগামীতা একটা বড় কারণ সম্পর্ক ভাঙ্গার পেছনে। আজকাল সম্পর্ক তৈরির অনেক আগেই অবিশ্বাস তৈরি হয়।

হাবিব: আমি ব্যাপারটাকে একটু আলাদাভাবে ভাবি। আমাদের বয়সটা আসলে আমাদের সম্পর্কে একটা 'এ্যাডভান্টেজ'। আমাদের চেয়ে কমবয়েসী বা 'ইমোশনালি ভালনারেবল' কেউ বহুগামীতা যেভাবে দেখে, আমাদের সেটাকে অনুধাবন করবার 'ম্যাচিউরিটি'টা অন্যরকম। আর আমি আমার চেয়ে বয়সে ছোট অনেক ছেলেদের দেখে তো আশা পাই, ওদের অনেকেই কিন্তু আমাদের চেয়ে অনেক বেশি স্মার্ট এবং জানে কখন কি করতে হবে। তবে অনেকের ক্ষেত্রেই কম বয়স বা 'ইম্যাচিউরিটি' একটা বড় কারণ যেকোনো ধরনের সম্পর্কে অস্থিরতা তৈরির জন্য।

বহুগামীতা ব্যাপারটাকে আপনারা কিভাবে দেখেন? প্রবণতাটা কি আমাদের মধ্যে প্রকট বেশি?

হাবিব: আসলে আমরা ছোটবেলা থেকে যে ধরনের ধর্মীয় এবং সামাজিক এবং পরিবেশে বেড়ে উঠেছি, আমাদের মধ্যে লুকিয়ে রাখার প্রবণতাটা কিন্তু অনেক বেশি। ছোটবেলা থেকেই যৌন প্রবৃত্তি ছাড়াও আরো অনেক রকম ব্যাপার কিন্তু আমরা আড়াল করতে করতে বেড়ে উঠতে থাকি। এসব আমাদের অনেকটা 'হিপোক্রেটিক' করে তোলে। একটি সুস্থ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে বহুগামীতা হয়তো কখনো গ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখা বা গোপন করাটা অনেক সময় আরো বড় অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। আমরা আরো খোলামেলা কথা বলতে পারলে ভালো হত। আর একটা ছেলে সারাজীবন তার পার্টনার ব্যতীত অন্য কারো দিকে আকৃষ্ট হবে না, সেটা কিন্তু বাস্তবসম্মত না। তবে বহুগামীতা আবার যদি অভ্যেসে পরিণত হয়, সেটাও বাজে ব্যাপার।

সোহেল: আমাদের সম্পর্কে পারিবারিক বা সামাজিক স্বীকৃতি না থাকায় গোপন করবার 'স্পেস'টা অনেক বড়।। বহুগামীতা ব্যাপারটা সেখান থেকেই সম্পর্কে ভাঙ্গন ধরাতে শুরু করে। বহুগামী ব্যাপারটা সমকামী বা বিষমকামী সবার মধ্যেই আছে, সেটা কোথায় চর্চার সুযোগ বেশি পায় সেটা ভেবে দেখতে হবে।

আপনাদের সম্পর্কে এরকম কোনো ব্যাপার কি হয়েছে?

হাবিব: একটা জায়গায় কেউ যে শুধু আলো দেখবে তাতো না। জীবনটাও তো আসলে আলো-অন্ধকারের মিশেল। চাইলে সেটাকে 'এক্সিডেন্ট' বা ইচ্ছাকৃত বা ভুল সবকিছুই বলা যায়। কখনো আমার ভুলে, কখনো ওর ভুলে, কখনো রেগে বা ইচ্ছাকৃতভাবেও অনেক সময় অনেক জিনিস হয়েছে যেটা নিয়ে আমরা খুশি হতে পারিনি যৌথভাবে। তবে এসবকিছুও আমাদের সম্পর্কের অংশই।

এরিস

২১ মার্চ-২০ এপ্রিল

চিংড়ি মাছ থেকে শুরু করে হারের বাজুবন্ধ, প্রতিদিন তার মোহনীয় হাসিটি দেখার জন্য এমন সব বিচিত্র উপহার নিয়ে তার সান্নিধ্য প্রত্যাশী খরিদ্দারদের আগমন নতুন কিছু ছিল না র‍্যাচেলের জীবনে। শুধু তার নয়, পূর্ণ যৌবনা যেকোনো বারবনিতার জন্যই এ অতি সাধারন ঘটনা। কিন্তু তারপরেও র‍্যাচেল নামটি এখনো ইতিহাসে দ্যুতি ছড়ায় তার পাওয়া বিস্ময়কর এক উপহারের জন্য। এই বিস্ময়কর উপহারটি যিনি দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিস্ময়কর সেই উপহারের চেয়েও বিচিত্র, রহস্যময় এক কৃতি মানব-চিত্রশিল্পী ভিনসেন্ট ভ্যানগগ, 'ইমপ্রেশনিজম' ঘরানার উত্তর পুরুষ। আর কি ছিল সেই উপহার? ভিনসেন্টের নিজ হাতে কাটা তার কানের কিছু অংশ!

একটি মানুষের কান উপহার পেয়ে র‍্যাচেলের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি, তবে তার প্রতিক্রিয়া একটু হলেও কম হত যদি রাশিতত্ত্ব নিয়ে তার কিছু পড়াশোনা থাকতো আর তিনি জানতেন, তার সেই রাতের খরিদ্দার ছিল একজন মেষ রাশির জাতক। একমাত্র মেষ জাতকের পক্ষেই বোধহয় সম্ভব এতোটা বেপরোয়া হওয়া, নিষ্ঠুরতকে এমন ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া।

১৮৮৮ ডিসেম্বরের তুষারশুভ্র সকালে নিজের কাটা কানটি খবরের কাগজে মুড়ে র‍্যাচেলকে উপহার দেন ভিনসেন্ট-অত্যন্ত যত্নসহকারে সেটিকে সংরক্ষণ করতেও বলেন। কেন তিনি এমন করেছিলেন, র‍্যাচেলের বারবার জিজ্ঞেস সত্ত্বেও সেদিন যে প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়নি, আজ এত শত বছর পর কিছুটা হলেও আমরা তা অনুমান করার চেষ্টা করতে পারি। কি সেই কারন? হয়তো ব্যর্থ প্রেম! তার সেই আপাত রোমান্টিক সম্পর্কটাও কিন্তু নিতান্ত অর্বাচীন কারো সাথে নয়, পল গগা, একই যুগের আরেক বিখ্যাত কবি ও শিল্পী। গগা এর প্রতি ভয়ংকর অনুরক্ত ভিনসেন্ট গগা তাকে ছেড়ে চলে যাবে এই ভয়ে তার সাথে শব্দযুদ্ধে লিপ্ত হয়েই কেবল ক্ষান্ত হয়নি, একবার রেজার ব্লেড দিয়ে তাড়িয়েও নিয়ে যায় তাকে। কিন্তু পরবর্তীতে অনুশোচনার অনলে দগ্ধ গগাহীন ভীনসেন্ট 'বোথে আদেলে'স ব্রোথেলে নিয়ম করে যাওয়া আসা শুরু করেন- হয়তো অতৃপ্ত কিছু বাসনা মেটাতে, হয়তো গগার বিকল্প খুঁজতে অথবা কেবল নিজেকে সামলাতে! সেই সময়ে মানসিকভাবে অনেকটা বিপর্যস্ত ভিনসেন্ট অনেক অদ্ভুত ক্রিয়াকালাপ শুরু করেন, কান কাটা হয়তো তার মধ্যে একটি। বলে রাখা ভালো ভিনসেন্টের কান কাটা নিয়ে আরো ছয় রকমের ভিন্ন মনঃস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ রয়েছে।

মহান এই কৃতিমানব শেষতক নিজেকে সামলাতে পারেনি, যেমন পারে না বেশিরভাগ মেষ রাশির জাতক। মেষ যা চায়, তাকে তা পেতেই হবে, তার জন্য যেকোনো কৌশল ধারণ করতে পারে মেষ। ধীর লয়ে এগোতে জানে না মেষ, প্রেমে পড়ে ভ্যান গগ হওয়াই তার পক্ষে সম্ভব, শাহজাহান নয়। ভ্যান গগকে ছেড়ে যদি কারো সাথে মেষের ভালো তুলনা চলে, তবে সে হলো ঈশপের খরগোশ! ক্ষিপ্র গতি থাকা সত্ত্বেও অলস, সরল, কিছুটা নির্বোধ এবং শেষতক উন্নাসিক। জীবনের রেসে হয়তো সেসব মেষই জিতে যারা কিছুটা হলেও এই পথ এড়িয়ে চলতে পারে। আর বাকিরা? হারজিত তাদের কাছে বিবেচ্য বস্তুই না, যখন তারা আকাশ ছোঁয় তখন সোল্লাসে চিৎকার করে আর যখন মাটি ছুঁই ছুঁই, তখন সক্রোধে!

বারোটি রাশির মধ্যে মেষের স্বাতন্ত্র্য তার পরিশ্রম করবার ক্ষমতায় এবং নির্ভীকতায়! নিবিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কন্টকময় পথ পাড়ি দিতে পারে, আবার পথিমধ্যে আগ্রহ হারিয়ে রওনা দিতে পারে নতুন মহাদেশের খোঁজে। কথা হচ্ছে, নিজ হতে আগ্রহ না হারানো পর্যন্ত তাকে টেক্কা দেবার সাধ্য কিন্তু ঈশপের কাছিমেরও নেই!

ক্রোধ মেষের অন্যতম শত্রু। এরা সহজেই রেগে যায় এবং রেগে গিয়ে হেরে যায়। বৃশ্চিকের মতো রেগে অন্যকে ভস্ম না করতে পারলেও শেষমেশ নিজের ক্ষতি ডেকে আনতে পারঙ্গম। রেগে গিয়ে গোঁয়ারের মতো অন্যকে আক্রমণ করলেও লম্বা দৌড়ে তার প্রভাব সামান্যই! অন্যকে গুঁতোতে গিয়ে নিজেই ঘায়েল হবার সম্ভাবনা তাই বেশি।

শিশুর মতো সরল মেষ। নিজ সমালোচনা শুনতে অপারগ, চাটুকার পরিবৃত মেষ তাই পরম সুখী। এই শিশুসুলভ আচরণের ব্যবহার করে সুবিধা হাসিলের চেষ্টা চালাতে পারেন অনেকেই।

প্রেমের ক্ষেত্রে অত্যন্ত আবেগী আর বিশ্বাসী মেষ। কিন্তু এখানেও চঞ্চলতা মুক্ত নয়। একই মানুষের প্রতি সারাজীবন বিশ্বস্ত থাকাটা তাদের কাছে মানসিকভাবে ক্লান্তিকর। আবার দ্বৈত সম্পর্কেও আরাম পায় না। বেশিরভাগ মেষই তাই সহজ হাল্কা সম্পর্কে সুখ পায়, নিজেকে কোনো গভীর সম্পর্কে জড়াতে চায় না। তবে জড়িয়ে পড়লে আবেগে ভেসে যেতে দেরী করে না। এক্ষেত্রে তার সঙ্গীকে পড়তে হতে পারে বিপাকে, মেষের নিত্যনতুন মনমেজাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলা চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। খুব বেশি সমালোচনা না করে কিছু শিশুসুলভ আদর দিয়ে এই দ্রুতগামী খরগোশটাকে বেঁধে রাখতে পারেন নিজ আঙ্গিনায়!

সাধারণত সিংহ এবং ধনুর সাথে মেষের স্বাচ্ছন্দ্য সবচেয়ে বেশি। পূর্ণপন্থী মকর এবং সংরক্ষণশীল কর্কট মেষকে দ্রুত বিরক্ত করে। মেষ রাশির অঙ্গনে চার্লি চ্যাপলিন, রবি শংকর থেকে শুরু করে হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান এন্ডারসান বা লিন্ডা গুডম্যানের মতন অনেক বিখ্যাত লোকের আনাগোনা রয়েছে। রাশিচক্রের প্রথম এই রাশিটিকে বলা চলে শিশুর প্রতীক। যারা মেষদের ভালোবাসে, তারা যেন তাদের শিশুদের মতোই ভালোবাসে। শিশুরা দুষ্টুমিতে পারঙ্গম, কখনো হামাগুড়ি দেবে তো কখনো উঠে দৌড়াবে, এই শিশুটিকে আগলে রাখার চেয়ে আনন্দদায়ক কি কিছু হতে পারে?

দ্রষ্টব্যঃ রাশিচক্রের দুটো কাজের মধ্যে প্রথম কাজ ভাগ্য গণনাকে কাল্পনিক আত্মতৃপ্তি ভেবে নিলেও দ্বিতীয় ভাগে এটি সম-চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন মানুষের চারিত্রিক নানা দিক নিয়ে নাড়াচাড়া করে। উল্লেখ্য যে প্রত্যেকটি মানুষই স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং তার উপর রাশিচক্রের প্রভাবের চাইতে জন্মোত্তর পরিবেশ, সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা এসবের বৈজ্ঞানিক প্রভাব অনেক বেশি। রাশিচক্রের উপরিউল্লিখিত তত্ত্বকথা [illegible] কোনো রাশির জন্যই বেদবাক্য নয়! ■

Scanned with MOBILE SCANNER

হেল্প লাইন

০১৭১৪০৪৮৪১৮

পুরুষের যৌনস্বাস্থ্য সেবায় আন্তরিক পরামর্শের জন্য

আপনার যে কোন ধরনের যৌন সমস্যায় বিশ্বস্ততার সঙ্গে
বন্ধু মধুমিতা সেন্টারে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারেন।

আইন আলাপ

০১৭৭১৪৪৪৬৬৬

এম এস এম এবং হিজড়া জনগোষ্ঠীর যে কোনো
আইনী পরামর্শ ও সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন

এছাড়াও এখানে আপনার যে কোনো ধরনের আইনী তথ্য, পরামর্শ
ও সহায়তার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে জানতে ও পরামর্শ পেতে পারেন।

বন্ধু সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
৯৯ কাকরাইল (দ্বিতীয় তলা), ঢাকা ১০০০

Scanned with
MOBILE SCANNER

FOLLOW US ON FACEBOOK JOIN OUR SOCIAL NETWORK FOLLOW US ON FACEBOOK FOLLOW

OUR SOCIAL NETWORK JOIN OUR SOCIAL NETWORK CALL US ROOPBAAN

OUR ROOPBAAN JOIN OUR SOCIAL NETWORK FOLLOW US ON FACEBOOK

OUR SOCIAL NETWORK FOLLOW US ON FACEBOOK JOIN OUR SOCIAL NETWORK FOLLOW US ON FACEBOOK

NETWORK FOLLOW US ON FACEBOOK CALL US ROOPBAAN

OUR SOCIAL NETWORK FOLLOW US ON FACEBOOK FOLLOW

NETWORK ROOPBAAN JOIN OUR SOCIAL NETWORK FOLLOW US ON FACEBOOK

SOCIAL NETWORK FOLLOW US ON FACEBOOK JOIN OUR SOCIAL NETWORK

OUR SOCIAL NETWORK FOLLOW US ON FACEBOOK

www.facebook.com/roopbaan

CALL US 01717473814 FOLLOW US ON FACEBOOK

OUR FOLLOW US JOIN OUR SOCIAL NETWORK FOLLOW US ON FACEBOOK

SOCIAL NETWORK JOIN OUR SOCIAL NETWORK FOLLOW US ON FACEBOOK

OUR SOCIAL NETWORK ROOPBAAN JOIN OUR SOCIAL NETWORK

BOOK ROOPBAAN JOIN OUR SOCIAL NETWORK FOLLOW US ON FACEBOOK

OUR SOCIAL NETWORK FOLLOW US ON FACEBOOK CALL US ROOPBAAN

FOLLOW US ON FACEBOOK JOIN OUR SOCIAL NETWORK FOLLOW US ON FACEBOOK

OUR SOCIAL NETWORK ROOPBAAN JOIN OUR SOCIAL NETWORK

BOOK ROOPBAAN FOLLOW US ON FACEBOOK

OUR SOCIAL NETWORK CALL US ROOPBAAN FOLLOW US ON FACEBOOK JOIN OUR SOCIAL NETWORK ROOPBAAN